মাসুদ রানা
**বেদুঈন কন্যা**
কাজী আনোয়ার হোসেন

# এক

লন্ডন।

সময়টা সন্ধ্যারাত। হিলটন ইন্টারন্যাশনাল-এর আটতলা। রেড কার্পেট রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বার।

বারোতলার স্যুইটে বসে প্রায় সারাটা দিন নিজ এজেন্সির কিছু পেন্ডিং ফাইল পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা। ভাবল, যাই, দু'-ঢোক হুইস্কি গিলে একটু ঝরঝরে হয়ে আসি।

চার ফ্লোর নীচে নেমে ঢুকে পড়ল রেড কার্পেট বার-এ। ভিতরে বেশ ভিড় দেখে একটু অবাকই হলো ও। বার-এর সামনে একটা গদিমোড়া সুদৃশ্য টুলে বসল।

মিনিট বিশেক পর হুইস্কির বিল মেটাল ও, টুল ছেড়ে সুইং ডোর-এর দিকে হাঁটছে। ঠিক এমনি সময় একটি নারীকণ্ঠ ওর কানে যেন মধুবর্ষণ করল, মনে হলো উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে অকস্মাৎ কোনও কোকিল গেয়ে উঠেছে। গলাটা এতই মিষ্টি যে, আকুলি-বিকুলি করে ওঠে বুকের ভিতরটা। নিজের অজান্তেই থেমে গেল ওর পা দুটো।

স্টেজ-এর দিকে ঘাড় ফেরাল রানা।

অমনি মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর।

যেন মস্ত বড় কোনও শিল্পী মনের মাধুরী মিশিয়ে ক্যানভাসে এঁকেছে উদ্ভিন্নযৌবনা, অপরূপ এক রমণীকে। তার চোখ-জুড়ানো দেহসৌষ্ঠব চুম্বকের মত ধরে রাখল ওর দৃষ্টি। গায়ের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা গোলাপি সিল্কের ঢোলা ঘাঘরা পরেছে সুন্দরী। কাঁধের

রেশমি চুলের স্তূপে স্বচ্ছ স্কার্ফ আটকানো। হাতকাটা কালো ব্লাউজের শাসন মানতে চাইছে না একটু ওভারসাইয, সুউন্নত স্তন যুগল।

রানার হার্টবিট বেড়ে গেছে। ঠোঁটের উপর একটু একটু ঘাম জমতে শুরু করল। এমন প্রশান্ত, কোমল ও পরিপাটি রূপ আগে বোধহয় কখনও দেখেনি রানা।

ফিরে এসে একটা টেবিলে বসতে হলো রানাকে।

মিষ্টি সুরে একটা মেলোডিয়াস পপ গাইছে মেয়েটি। উচ্চারণে কোনও টান না থাকলেও, চেহারা ও পোশাক দেখে তাকে ইউরোপিয়ান বলে মনে হলো না। সন্দেহ নেই অসাধারণ মিষ্টি মেয়েটির কণ্ঠ। তুলনাহীন।

পুরো গানটা না শুনে ওঠা গেল না। হাতে কাজ না থাকলে আরও কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে ছিল রানার। তবে নিজের স্যুইটে ফেরার আগে বারম্যানকে জিজ্ঞেস করে মেয়েটির নাম জেনে নিল।

সুরাইয়া ফারদিন।

আশ্চর্য, এত ভাল গলা নিয়ে এই মেয়ে হোটেলের বার-এ কেন গাইছে? ওর তো সুপারস্টার হয়ে যাওয়ার কথা। নাকি শুটিং স্টার – কোনও কারণে ঝরে পড়েছে মাটিতে?

পরদিনও ঠিক ওই সন্ধ্যার সময় কী এক অদম্য আকর্ষণে রেড কার্পেটে নেমে এল রানা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো আজও। মৃদু একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার আগে বোধহয় মেয়েটির ঠোঁটেও –তবে নিশ্চিত নয় রানা।

নিশ্চিত হলো পরদিন একই জায়গায়, একই সময়ে; কারণ এবার চোখাচোখি হওয়া মাত্র মেয়েটিই হেসেছে, জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিয়েছে রানা। সেদিন পরিচয়ও হলো ওদের।

গান শেষ হতে যখন আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি, রানাকে চমকে দিয়ে কে যেন ওর কানের কাছে ফিসফিস করল, 'সার? মিস্টার মাসুদ রানা?'

ঘাড় ফেরাতে প্রথমে মস্ত একজোড়া পাকা গোঁফ দেখতে পেল রানা। গোঁফের মালিক প্রকাণ্ডদেহী এক নিগ্রো, কুচকুচে কালো। হাসছে, দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। নিকষ কালো রঙের ঢোলা সুট পরায় ভীতিকর দেখাচ্ছে চেহারাটা। 'আমি ইউসুফ মোরদেজা, সার। ম্যাডাম সুরাইয়ার বডিগার্ড। আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে, সার।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'আমার সঙ্গে যদি একটু আসতেন, সার,' বলল নিগ্রো বডিগার্ড। 'ম্যাডাম বলে দিয়েছেন গান শেষ হবার আগেই আমি যেন আপনাকে তাঁর টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাই।'

ইতোমধ্যে রানা জেনেছে, সুরাইয়ার জন্য একটা টেবিল রিজার্ভ করা থাকে, গানের অনুষ্ঠান শেষ হলে ওখানে বসে কফি খায় সে। চেয়ার ছেড়ে লোকটার মুখোমুখি হলো রানা। বিস্মিত হয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কীভাবে তোমার ম্যাডাম আমাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন?'

'কালও ঠিক এই টেবিলে বসেছিলেন আপনি, সার,' বলল নিগ্রো দেহরক্ষী। 'চেহারার বর্ণনা দিয়ে আপনাকে দেখে রাখতে বলেছিলেন ম্যাডাম।' মাথা ঝুঁকিয়ে সবিনয়ে তার পিছু নেওয়ার জন্য ইশারা করল সে।

নির্দিষ্ট টেবিলটায় এসে বসল রানা। ওকে অপেক্ষা করতে বলে বার-এর এক কোণে নিজের পজিশন নিল নিগ্রো বডিগার্ড ইউসুফ মোরদেজা।

একটু পরেই গানের অনুষ্ঠান শেষ হলো। গায়িকার প্রতি সম্মান দেখিয়ে উপস্থিত সবাই যে যার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, করতালিতে মুখর হয়ে উঠল বার। কাঁধে একটা পশমি

চাদর ফেলে স্টেজ থেকে নেমে আসছে সুরাইয়া ফারদিন। নিজের টেবিলে পৌঁছাতে বেশ একটু দেরি হলো তার, কারণ অনেকেই তার অটোগ্রাফ নিচ্ছে।

তারপর এক সময় সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে।

'হাই!' বলে হাসল রানা।

'হাউ আর ইউ!' বলে হ্যান্ডশেকের জন্য রানার বাড়ানো হাতটা ধরল সুরাইয়া।

'খুব ভাল গান আপনি, একথা আপনার জানা আছে,' বলল রানা। 'অতুলনীয়া সুন্দরী, একথাও নিশ্চয়ই শুনছেন সেই ছোটবেলা থেকেই। আজ আরও দুটা কথা জেনে নিন : আশ্চর্য রহস্যময় আপনার রেশমি চুল, আর হাঁটার ভঙ্গিটা সত্যিই ভারি চমৎকার!'

ওর কণ্ঠের আন্তরিকতা স্পর্শ করল মেয়েটিকে। আপাদমস্তক দেখল রানাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনার চেহারায় সাহসী একজন মানুষের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। এবং, নো ডাউট, আকর্ষণীয়।'

একসঙ্গে হেসে উঠল দুজন। বসল মুখোমুখি দুটো চেয়ারে।

'সাহসী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'দেখুন না, আপনি ডাকতেই সাহস করে চলে এসেছি। আর বাকিটুকু আপনি বলেছেন ভদ্রতা করে। রোজ একবার করে আয়নার সামনে দাঁড়াই শেভ করতে – আকর্ষণীয় আমি মোটেও নই। তবে, বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটুও বাড়িয়ে বলিনি।'

মৃদু হাসল মেয়েটি। 'শিল্পী ছাড়াও আমার আরও বড় একটা পরিচয় আছে,' বলল সে, গর্বিত ভঙ্গিতে নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল। 'আমি বেদুঈনকন্যা, ফিলিস্তিনি।'

শুনে ভাল লাগল রানার। জমে উঠল গল্প।

এভাবেই শুরু। পরস্পরকে ভাল লাগল ওদের। তারপর এক সময় মনে হলো পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতার দিকে এগোচ্ছে। সেই সূত্রেই সুরাইয়া ফারদিন সম্পর্কে অনেক কথা জানা হলো রানার।

তার একটা রোমহর্ষক অতীত আছে।

লেবানন সীমান্তের কাছে বেদুঈনদের একটা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছিল তারা। ইজরায়েলি প্লেন থেকে বোমা ফেলা হয়েছিল সেখানে। তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

ওই নৃশংস হামলায় তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সবাই মারা গেছে। জ্ঞান ফেরার পর দেখল সে-ও মারাত্মকভাবে আহত, কাছাকাছি একটা খ্রিশ্চান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে।

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে ছ'মাস লেগে গেল সুরাইয়ার। কিন্তু কেউ নিতে না আসায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটা মিশনারি স্কুলে পাঠিয়ে দিল তাকে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সেই স্কুলে লেখাপড়া ও গান-বাজনা শিখেছে সুরাইয়া ফারদিন। তারপর ওখান থেকে ওই মিশনারিদের পরিচালিত লন্ডনের একটা কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

পারফর্মিং আর্টস-এ অনার্স করেছে সে। বয়স চব্বিশ বছর পুরো হতে মিশনারি কলেজ ছেড়ে কঠিন, অচেনা, অনিশ্চিত দুনিয়ায় বেরিয়ে আসতে হয়েছে সুরাইয়াকে। ইংরেজি, হিব্রু ও আরবী ভাষা ভালই শিখেছে সে।

তারপর বেশ কিছুদিন এখানে-সেখানে চাকরি নিয়েছে আর ছেড়েছে সুরাইয়া। ওর শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় লেগেছে মানুষের কাছে ওর রূপ-সৌন্দর্য। গুণের কদর না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও সুবিধে করতে না পেরে অবশেষে লন্ডন হিলটনের অভিজাত রেস্তোরাঁ রেড কার্পেটের নিয়মিত গায়িকা হিসেবে চাকরি নিয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই ওদের পারস্পরিক আকর্ষণ এতই তীব্রতা

পেল যে, একদিন দেখা না হলে অস্থির হয়ে ওঠে মন, খালি মনে হয় বুকের ভিতরটা। বেশ কয়েকবার চুপিচুপি রানার ফ্ল্যাটে এসেছে সুরাইয়া, রানা ওর সুইটে গেলে এটা-ওটা আরবি খাবার রেঁধে খাইয়েছে।

কথায় কথায় তাকে একদিন জিজ্ঞেস করল রানা, 'এত ভাল গলা তোমার, কেউ তোমাকে বলেনি যে অ্যালবাম বের করো, আরও বড় স্টেজে গাও?'

'কই, না,' বলল সুরাইয়া, একটু যেন বিব্রত। 'তার দরকারই বা কী, এরা অনেক টাকা দেয় – এই তো বেশ আছি।'

এটা সুরাইয়ার বিনয় বলে মনে হলো রানার। তবে ভাবল, এ ব্যাপারে কি-ই বা করবার আছে ওর। পরমুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

রানার বন্ধুদের কেউ কেউ সঙ্গীত জগতের দিকপাল। তাদের এজেন্ট আছে, যারা মিউজিকাল পারফরমান্স অর্গানাইজ করে। সুরাইয়া ফারদিনের সঙ্গীত-প্রতিভার কথা জানতে পারলে তারা হয়তো ওর জন্য কিছু একটা করবার আগ্রহ বোধ করবে।

বিশেষ তেমন কিছুই করল না রানা, শুধু ওই বন্ধুদের ডেকে সুরাইয়ার গান শুনিয়ে দিল একদিন। ব্যস, হই-হই করে উঠল তারা, বলল – সুরাইয়া ফারদিন গোটা দুনিয়াটাকে নাকি মাতিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিজেও জানেন না কী বিপুল অর্থ ও খ্যাতি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে ইত্যাদি।

শুরু হয়ে গেল তাদের আয়োজন ও প্রচার। সেই সঙ্গে চলল অর্কেস্ট্রেশনের সঙ্গে সুরাইয়ার কঠোর অনুশীলন ও স্টেজ-রিহার্সেল। শিল্পী নবীন হলে কী হবে, বিশেষজ্ঞদের বিচারে সঙ্গীত জগতে নতুন একটা মাত্রা যোগ করতে চলেছে ফিলিস্তিনি এই বেদুঈন গায়িকা; তাই প্রচারটা একটু বেশিই করা হলো।

এত কিছু হচ্ছে, কিন্তু এজেন্সির কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তেমন খবর রাখতে পারছে না রানা। এর মাঝে একদিন

টেলিফোন করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল সুরাইয়া। রিহার্সেল নেই, সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে অপেরায় যেতে চায় সে। 'ঠিক আছে, পৌঁছে যাব,' বলল ও।

অপেরা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরছে ওরা, রানার দিকে ফিরে সুরাইয়া বলল, 'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!' হাতব্যাগ থেকে বের করে রানার দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে ধরল সে।

'আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে কেন?' এনভেলাপ খুলে ভিতর থেকে একটা কার্ড বের করল রানা।

রয়াল অ্যালবার্ট হল-এ সুরাইয়া ফারদিনের জন্য একক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে, এটা তারই আমন্ত্রণ-লিপি; মাসুদ রানার নামে একটা বক্স বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে।

'সব ধন্যবাদ তোমারই তো প্রাপ্য,' আবার বলল সুরাইয়া। 'আয়োজকরা বলছেন, তুমি অকুণ্ঠ প্রশংসা না করলে তাঁরা আমার গান শুনতে আসতেন না। আর গান না শুনলে জানতেও পারতেন না... নাহ্, থাক।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না, সুরাইয়া,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'প্রতিভা কখনও চেপে রাখা যায় না।'

রয়াল অ্যালবার্ট হল-এ আজ সেই অনুষ্ঠান।

সেন্ট্রাল অ্যারেনার চারপাশের বক্স ও গ্যালারিগুলো ভরে উঠেছে। কয়েক হাজার শ্রোতা উপস্থিত; বেশিরভাগই তাঁরা বিদগ্ধ শ্রোতা, সঙ্গীত ও সুরের সমঝদার।

নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে রবাব-এর কোমল সুর। যন্ত্রীরা সবাই প্রস্তুত, কেউ কেউ মৃদু টুং-টাং শব্দে সূক্ষ্মভাবে সুর বাঁধছে তাদের যন্ত্রে – যে-কোনও মুহূর্তে মঞ্চের পরদা উঠবে। দর্শক-শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

পরদার আড়ালে আয়োজকরা সবাই খুব ব্যস্ত। তবে কেন

যেন তাদের সবার মধ্যে চাপা একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে গভীর উদ্বেগে পরিণত হচ্ছে।

এতক্ষণ নিজের বক্সেই বসেছিল রানা, সুরাইয়ার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে স্টেজের পিছনে চলে এল। আয়োজকদের উদ্বেগ লক্ষ করে ভ্রূ কোঁচকাল ও।

আরও দশ মিনিট পর আতংকে ঘামতে শুরু করল তারা।

'কী ব্যাপার?' তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

ভদ্রলোক জানালেন, সুরাইয়ার ফ্ল্যাট থেকে রয়াল অ্যালবার্ট হল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। চল্লিশ মিনিট আগে রওনা হয়েছেন তিনি। এখনও তাঁর না এসে পৌঁছানোর কারণটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

চিন্তারই কথা, ভাবল রানা। বলল, 'হয়তো ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছেন।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আমরা খবর নিয়েছি, রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও কোনও জ্যাম নেই। ওদিকে কোনও অ্যাক্সিডেন্টও হয়নি। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, ম্যাডামকে আমরা সেল ফোনেও পাচ্ছি না, সেটটা সম্ভবত বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

এবার বিচলিত না হয়ে পারল না রানা। 'পুলিশ ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে জানানো দরকার,' বলল ও।

'কিছুক্ষণ আগে থানাকে সব জানানো হয়েছে,' বললেন উদ্যোক্তা ভদ্রলোক।

ওদিকে হল ভর্তি লোকজন এতক্ষণ উসখুস করছিল, এবার তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে শুরু করেছে। অভিযোগে সরব হয়ে উঠছে তারা।

নিজের সেল ফোন থেকে সুরাইয়ার মোবাইল ফোনে বার কয়েক রিং দিল রানা। কোনও সাড়া নেই। তার ফ্ল্যাটে ল্যান্ড ফোন আছে, ডায়াল করলে রিঙ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ।

অধীর অপেক্ষায় আরও পনেরো মিনিট পার হলো। সুরাইয়ার দেখা নেই। দেখা নেই তার গাড়ি বা বডিগার্ডেরও।

তারপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে একটা খবর এল। সুরাইয়ার প্রাইভেট কারটা টেমস নদীর একটা ঘাটের কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিতরে কেউ নেই।

সবার মনে নানা রকম আশঙ্কা জাগল। সুরাইয়াকে কি কিডন্যাপ করা হয়েছে? নাকি খুন করে লাশ গুম করে ফেলার কেস? কেউ কিছু ধারণা করতে পারছে না। সুরাইয়া একা নয়, তার সঙ্গে নিগ্রো বডিগার্ড ইউসুফ মোরদেজাও গায়েব হয়ে গেছে বেমালুম।

শেষপর্যন্ত আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বাতিল করা হলো অনুষ্ঠান।

সারাটা রাত স্থানীয় পুলিশ ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল রানা। তবে বৃথাই। কোথাও থেকে কোনও খবর এল না – না ভাল, না মন্দ।

অমীমাংসিত একটা রহস্য হয়ে উঠল কেসটা। এক দুই করে পার হয়ে গেল দিনগুলো। যেন স্বপ্ন দেখেছিল রানা, বাস্তব দুনিয়ায় সুরাইয়া ফারদিন বলে কোনওদিন কেউ কোথাও ছিল না।

ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্ক ও ঢাকা থেকে একবার করে ঘুরে এসেছে রানা। মাঝখানে পার হয়ে গেছে তিনটে মাস।

সেদিন বিকেলে রয়াল অ্যালবার্ট হলকে পাশ কাটিয়ে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় ফেরার সময় মনের পরদায় ভেসে উঠল সুরাইয়ার সরল মুখটা। আশ্চর্য! গেল কোথায় মেয়েটা? নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

অফিসে পৌঁছে রিসেপশন কাউন্টারকে পাশ কাটিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে রানা, 'মাসুদ ভাই,' বলে ডাকল ওকে চটপটে রিসেপশনিস্ট মণিকা আফরোজা। 'আপনার একটা চিঠি।'

থেমে সাদা এনভেলাপটা নিল রানা। খামের কোথাও কোনও স্ট্যাম্প নেই। শুধু গোটা গোটা হরফে ইংরেজিতে লেখা – মাসুদ রানা। 'কে দিয়ে গেল?' জানতে চাইল ও। 'কখন?'

'ঘণ্টা দুয়েক আগে,' বলল মণিকা। 'মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, মুখে দাড়ি আছে, মাথায় টুপি, ঢোলা জোব্বা পরা। দেখে মনে হলো আরব দেশের লোক।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, পা চালিয়ে নিজের কামরায় উঠে এল।

এনভেলাপ খোলার পর সাদা এক টুকরো কাগজ বেরুল। তাতে টানা হাতে ইংরেজিতে কয়েকটা লাইন লেখা। অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

খুব বিপদে আছি – সুরাইয়া ফারদিন।

ফ্যামাগুস্তা বে। স্যালামেস বন্দর।

কেয়ার ফ্রি বিচ ক্লাব।

# দুই

সুরাইয়া তা হলে বেঁচে আছে!

ভাল লাগার অনুভূতি হলো রানার – আবার দেখা হবে তার সঙ্গে! পরমুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিল, সুরাইয়ার বিপদ!

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করছে রানা – ফ্যামাগুস্তা বে, স্যালামেস বন্দর – সাইপ্রাসে না? হ্যাঁ, টার্কিশ রিপাবলিক অভ নর্দান সাইপ্রাসে। সংক্ষেপে যেটাকে তুর্কি সাইপ্রাস বলা হয়।

সময় নষ্ট না করে সাইপ্রাস সম্পর্কে জানবার জন্য ল্যাপটপ

কমপিউটার অন করে এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ওপেন করল রানা।

তুরস্কের উপকূল থেকে আশি কিলোমিটার দক্ষিণে, ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সাইপ্রাস। যিশুর জন্মের চোদ্দোশো বছর আগে সাইপ্রাসকে কলোনি বানায় গ্রিস; পরে ঈজিপশিয়ান, পারশিয়ান, রোমান, ব্রিটিশ ও টার্কিশ শাসকরা দেশটা দখল করে নেয়। সত্তরের দশকে গ্রিক সাইপ্রিয়ট ও তুর্কি সাইপ্রিয়ট, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের কারণে গোটা দ্বীপে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনিশশো চুয়াত্তর সালে সাইপ্রাসের উত্তরদিকটা দখল করে নেয় তুরস্ক।

রানা জানে উত্তর সাইপ্রাসে মুসলমান, অর্থাৎ তুর্কি সাইপ্রিয়ট-এর সংখ্যাই বেশি; তবে খ্রিশ্চান সাইপ্রিয়টের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন জাত ও ধর্মের লোকজন মোটামুটি শান্তিতেই বসবাস করছে ওখানে।

দক্ষিণ সাইপ্রাসে খ্রিশ্চান গ্রিক সাইপ্রিয়টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, সেখানেও প্রচুর মুসলমান ও ইহুদি আছে। সাইপ্রাস ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়, যেমন – অপরাধ করে একদিক থেকে আরেকদিকে পালিয়ে যায় ক্রিমিনালরা। এদিকটা দেখবার জন্য জাতিসংঘ থেকে পাঠানো আর্মড পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুই সাইপ্রাসের পুলিশ কমিশনাররা প্রতি হপ্তায় ইউ.এন. পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

থাকুক ছুটিতে, বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হবে কী কারণে, কেন তুর্কি সাইপ্রাসে যাচ্ছে রানা। সেল ফোনে সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। অপরপ্রান্ত থেকে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খান সরাসরি রিসিভ করলেন কলটা।

সুরাইয়া সম্পর্কে যা জানে সংক্ষেপে বস্‌কে জানাল রানা।

সবশেষে মেয়েটি কোথায় আছে জানিয়ে বলল, তার এখন খুব বিপদ, তাকে সাহায্য করতে চায় ও।

'বেদুঈন কন্যা হোক বা না হোক, গুণী হোক বা নির্গুণ; আমি চাই না কোনও মেয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ো তুমি,' বললেন রাহাত খান। 'তবে বিশেষ কারণে এ-ব্যাপারটা আলাদা, ওকে তোমার অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। উইশ ইউ গুড লাক, মাই বয়,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

ফ্যামাগুস্তা বে।

স্যালামেস বন্দরে পৌঁছে প্রথমেই একটা ইয়ট ভাড়া করবে রানা। এখানে ওর কাভার : বিদেশি ট্যুরিস্ট, ডাঙায় ফুর্তি করবে, পানিতে মাছ ধরবে।

জেটির দিকে হাঁটছে রানা, সিটারেট টানতে টানতে এক ভদ্রলোক ওকে পাশ কাটিয়ে উল্টোদিকে চলে গেলেন – বাতাসে গাঁজার মৃদু গন্ধ পেল ও।

দেখামাত্র ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছে রানা। কপালে অস্পষ্ট চিন্তার রেখা ফুটল, ভাবল – কী ব্যাপার, সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর সিনিয়র এজেন্ট আদনান মেনদেরেস এখানে কেন?

জেটিতে বোটের সংখ্যা এমনিতেই বেশি নয়, তার উপর একটা বাদে কোনও বোটই পছন্দ হচ্ছে না রানার।

সাদা ইয়ট ওটা, নাম ফরচুনা, ঝকঝকে তকতকে চেহারা দেখে বোঝা যায় মালিক খুব যত্ন করে ওটার।

রেইলিং ঘেঁষে ফেলা ডেক চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে এক লোক, হাত দিয়ে কপাল ও চোখ ঢাকা। ওখানে একটা চেয়ার আছে, এটা আন্দাজে ধরে নিতে হচ্ছে, কারণ দৈত্যাকার লোকটা বসবার পর সেটার কোনও অংশই দৃশ্যমান নয়, বিপুল থলথলে চর্বি ও মাংসে ঢাকা পড়ে গেছে সবটুকু। লোকটার হাত ও ঘাড়ের অনাবৃত অংশ দেখে বোঝা যাচ্ছে তার গায়ের রঙ লজ্জায় ফেলে

দেবে আলকাতরাকেও।

'এই যে, মিস্টার, এই বোট কি ভাড়া হবে?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একবার তো বললাম ফোটেন, আবার দিকদারি করছেন কেন?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বিকট দানব।

'ভুল করছেন, আমি এইমাত্র এসেছি,' বলল রানা।

'তা হলে আপনিও ফোটেন,' চর্বি ও মাংসের ডিপো থেকে আওয়াজ বেরুল। 'অভাবে না পড়লে আমি বোট ভাড়া দিই না।'

হাসি পেলেও চেপে রাখল রানা। 'ও, আচ্ছা, কুঁড়ের বাদশা,' বলল ও। 'সেজন্যেই এত রকমের অভাব চোখে পড়ছে।'

'কী?' কপাল থেকে হাত সরাল কালো ভূত, একটা চোখ মেলে তাকাল রানার দিকে। 'এত রকমের অভাব মানে?'

'এই যেমন বুদ্ধি, ফিটনেস ইত্যাদি।'

প্রকাণ্ডদেহী লোকটা কুণ্ডলী ছাড়াল। শরীরটার মত, তার চোখ দুটোও বিরাট, বিস্ময়ের ধাক্কায় পিরিচের মত বড় হয়ে আছে। তার নড়াচড়ায় মনে হলো দুলে উঠল ইয়ট। ফুটবলের মত শরীরটা রেইলিং টপকে চলে এল জেটিতে।

পিছু হটবে, তার সুযোগই পেল না রানা, হাতির পায়ের মত একজোড়া হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল লোকটা। নিজের চওড়া বুকের সঙ্গে পিষছে ওকে। ঝগড়ার মুডে নেই ও।

'আই য়্যাম সরি। রিয়েলি সরি।' বলতে চাইল রানা, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। কিন্তু লোকটা ছাড়ছে না দেখে বাধ্য হলো জুজিৎসুর একটা জটিল প্যাঁচে ওকে তিনহাত দূরে ছিটকে ফেলতে। মাটিতে পড়েই একলাফে উঠে দাঁড়াল দানব, কালো মুখে ঝকঝকে সাদা হাসি। হাসছে দৈত্যটা। 'আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, মিস্টার মাসুদ রানা, সার। কিন্তু আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি,' সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসছে সে তার সরল হাসি। 'আমি রডরিক-এর ভাই সালেভান। সেই রডরিক, মনে

আছে, যে আপনাকে বলেছিল – আই লাভ ইউ, ম্যান? মনে পড়ে?'

এতক্ষণে রানার চোখে পড়ল চেহারার মিলটা। কাঠামোর মিলও প্রায় অবিকল। 'কেন মনে পড়বে না,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল ও। 'তা আপনি এখানে?'

'এখানে আমি সরদারি করি, মিস্টার রানা। তুর্কি সাইপ্রাসের সব আফ্রিকান আমার শিষ্য। কেউ আমার নাম ধরে না, সেটা বোধহয় জানেই না – সবাই আমাকে কাফ্রি সরদার বলে ডাকে। বেয়াদপি করেছি, সেজন্যে মাফ করবেন। আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি বলুন। এখানে আপনার কী কাজ?'

'কী কাজ এখনও জানি না,' বলল রানা। 'আপাতত ট্যুরিস্ট হিসেবে সময় কাটাব, ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখব, লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হব। তারপর দেখা যাবে।'

'রডরিক আপনাকে ভাই মনে করত, আমিও আপনাকে ভাই বলেই জানি,' বলল কাফ্রি সর্দার। 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করে যে-কোনও কাজ দিতে পারেন। দেখবেন কাজটা হয়ে গেছে।'

ইয়ট ফরচুনা ভাড়া নিল রানা আগামী পনেরো দিনের জন্য। নিজের চেহারা খানিকটা বদলে নিয়েছে ও, সহজে যাতে কেউ ওকে চিনতে না পারে।

অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, হঠাৎ করে সুরাইয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত হবে না। প্রথমে আড়াল থেকে লক্ষ রাখবে, বুঝতে চেষ্টা করবে কী ধরনের বিপদে পড়েছে সে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

শিক্ষা-দীক্ষা তেমন না থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত একজন মানুষ কাফ্রি সরদার সালেভান; ঠোঁটের ফাঁকে সারাক্ষণ লেগে আছে মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়ানো নির্মল হাসি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে ভাল লেগে গেল রানার।

কাফ্রি সরদারের আরেকটা গুণ, বন্দর নগরী স্যালামেসের

কোথায় কী আছে, কার কী পরিচয়, সব তার শুধু জানা নয়, নখদর্পণে। রানার কাছ থেকে চেহারার বর্ণনা শুনেই বলে দিল কোথায় পাওয়া যাবে ওর প্রিয় বান্ধবীকে।

তার হিসাবে কমবেশি তিনমাস হতে চলল বিচ ক্লাব কেয়ার ফ্রি-তে গান গাইছে এক মেয়ে, রানার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে তার চেহারা। তবে মেয়েটির নাম সুরাইয়া নয়, দিলরুবা।

কাফ্রি সরদারকে নিয়ে প্রথমদিন বিকেলেই কেয়ার ফ্রি বিচ ক্লাবে চলে এল রানা।

ক্লাবের মালিক একজন জার্মান, নাম জিমি মোরেল। বয়স সত্তরের কম নয়, কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য এখনও অটুট। কাফ্রি সরদার তাঁর সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল। 'মিস্টার মাসুদ রানা, ট্যুরিস্ট। মাছ ধরার জন্যে আমার ইয়ট ভাড়া নিয়েছেন।'

ভারি অমায়িক এবং নিপাট ভদ্রলোক জিমি মোরেল, ক্লাবের কোথায় কী আছে সব ঘুরিয়ে দেখালেন রানাকে।

বন্দর নগরী স্যালামেসে শুধু কেয়ার ফ্রি বিচ ক্লাবেই রয়েছে ক্যাসিনো ফ্যাসিলিটি। সাধারণত ইউরোপ-আমেরিকার ট্যুরিস্টরা এখানে জুয়া খেলতে আসে, তবে আরব জাহানের কিছু শেখ ও আমিরও আসে। বার ও ক্যাসিনোর সঙ্গে ট্যুরিস্টদের জন্য এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

রাত কাটাবার জন্য ইয়ট মন্দ নয়, তবে চারতলার একটা স্যুইট রিজার্ভ করে রাখল রানা। কেয়ার ফ্রিতে নিজের একটা আস্তানা থাকলে ধরতে সুবিধে হবে সুরাইয়ার ওপর কারও 'নেকনজর' আছে কি না।

ক্লাবের তরফ থেকে দুটো বিয়ার অফার করা হলো ওদেরকে। বার-এ বসে রানার সঙ্গে বেশ কিছু লোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন জিমি মোরেল, তাদের মধ্যে পাইলট রাহি সামদানি ও সার্জেন্ট এনভার নেকমেতিন রয়েছে, রয়েছেন সিরিয়ান ট্যুরিস্ট আদনান মেনদেরেসও।

মেনদেরেস সম্পর্কে বলা হলো, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী তিনি, বহু মিল-কারখানার মালিক। রানা বুঝে নিল, এটা তাঁর কাভার।

আরও কয়েকজন তরুণ নতুন খদ্দের রয়েছে, ক্লাব মালিক জিমি মোরেলই তাদেরকে চেনেন না, কাজেই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠল না।

তবে আদনান মেনদেরেসকে যেমন একনজরেই চিনতে পেরেছে, এদেরও অন্তত তিনজনকে দেখামাত্র চিনে ফেলল রানা। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের এসপিওনাজ এজেন্ট তারা।

পুরানো প্রশ্নটাই নতুন আঙ্গিকে আবার জাগল রানার মনে, এতগুলো ইন্টেলিজেন্সের অপারেটর তুর্কি সাইপ্রাসে কী করছে? তাদের ভাব দেখে মনে হলো সিনিয়র সিরিয়ান এজেন্ট আদনান মেনদেরেসের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে পরামর্শ করতে এসেছে তারা। মেনদেরেস রানাকে চেনেন না, চিনলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারত রানা কী ব্যাপার।

প্রাইভেট একটা চার্টার কোম্পানির মালিক তরুণ সামদানি, ছোট একটা সিপ্লেন চালায়। পুরোদস্তুর একটা এয়ারপোর্টের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় আয়োজন স্যালামেসে আছে, তবে সে-সব খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

রাহি সামদানির চোখে-মুখে বিষণ্ন ও উদাস একটা ভাব লক্ষ করল রানা। সেটা বুঝতে পেরে ওর কানের কাছে ফিসফিস করলেন বৃদ্ধ রসিক জার্মান, জিমি মোরেল, 'পাইলট সামদানির মন খারাপ, কারণ আমাদের নতুন গায়িকা তাকে নাকি একদমই পাত্তা দিচ্ছে না।'

'তাই!'

সুদর্শন তরুণ সার্জেন্ট এনভার নেকমেতিন অত্যন্ত দক্ষ অফিসার, তার কড়া নজরদারির কারণে বন্দর ও উপকূল এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বেশ ভালই আছে।

আদনান মেনদেরেসের বিত্ত-বৈভবের খবর জানা গেল–

সিরিয়ার বিশিষ্ট নাগরিক, মিলিওনেয়ার ব্যবসায়ী। দুটো রিফাইনারি ও স্টিল রি-রোলিং ফ্যাক্টরির মালিক ছাড়াও নানান ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চান্নর কম না হলেও, আউটডোর লাইফের টান এখনও তাঁকে ছাড়েনি, ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না।

এরপর খুক করে কেশে কাফ্রি সরদার সালেভান রানাকে জানাল, ওর চেয়ে মাত্র কয়েক মিনিট আগে এই মেনদেরেস ভদ্রলোকই তার বোট ফরচুনা ভাড়া করতে গিয়েছিলেন। তেমন অভিজ্ঞতা না থাকলেও, ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে বড় আকারের মাছ ধরবেন। ভাড়া করা একটা মোটর বোট নিয়ে শুরুও করেছিলেন, কিন্তু একটা লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মোটর বোটটার বেশ ক্ষতি হয়েছে, মেরামতের জন্য সময় লাগবে। বন্দরে ভাল কোনও বোট ভাড়া পাওয়া খুব কঠিন একটা ব্যাপার, সরদারও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কাজেই আপাতত হাত-পা গুটিয়ে ডাঙায় বসে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

এ নিয়ে নিজের কপালকে দায়ী করছেন মেনদেরেস, সৌজন্য বোধ থেকে রানা তাঁকে আশ্বস্ত করল, 'একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আর তা যদি না হয়, আমাদের ইয়টে চলে আসবেন। আমারও তো মাছ ধরার খুব শখ।'

সন্ধে ঠিক সাতটায় ডান্স ফ্লোরে বেরিয়ে এল একদল নর্তকী। সবাই তারা রাশান তরুণী, ব্যালে শিল্পী। তাদের নাচ শেষ হতে ডান্স ফ্লোরে হাজির হলো মিশরীয় এক বেলি ডান্সার।

এক মুহূর্ত পর ফ্লোরের এক কোণে রূপের আগুন নিয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠল – হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে গান ধরল এক তন্বী ফিলিস্তিনি। দিলরুবা নয়, প্রথম দর্শনেই তাকে চিনতে পারল রানা, সুরাইয়া। তার গানের তালে তালে কোমর ও পেটে ঢেউ তুলছে মিশরীয় বেলি ডান্সার।

আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট থাকল রানা ওখানে। পরিবেশটা

খেয়াল করল, চোরা চোখে দেখে নিল উপস্থিত লোকজনকে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সুরাইয়ার প্রতিটি আচরণ।

না, পরিষ্কার বুঝল রানা, সুরাইয়া ওকে চিনতে পারেনি। কারণটা শুধু ছদ্মবেশ নয়, রানা বসেছেও বেশ অনেকটা দূরে।

আরও একটা ব্যাপার স্পষ্ট, অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছে সুরাইয়া। খানিক পর পর এদিক-সেদিক ছুটে যাচ্ছে তার অস্থির দৃষ্টি।

পরদিন কাজে নেমে পড়ল রানা। কারও মনে কোনও রকম সন্দেহ না জাগিয়ে সুরাইয়া সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করছে ও।

দুদিন পর পরিষ্কার একটা চিত্র পাওয়া গেল। বিচ ক্লাবের তিনতলার একটা স্যুইটে একা থাকে দিলরুবা ওরফে সুরাইয়া। প্রতিদিন সন্ধে সাতটায় অনুষ্ঠানে আসে সে, তা ছাড়া ওই স্যুইট ছেড়ে সাধারণত কোথাও তাকে যেতে দেখা যায়নি।

স্থানীয় তরুণ বা বিদেশি ট্যুরিস্ট যারা বিচ ক্লাবে আসা-যাওয়া করে তারা প্রায় সবাই এই মধুকণ্ঠী অপ্সরার জন্য পাগল, কিন্তু কেউ তারা তার কাছ থেকে কোনওরকম প্রশ্রয় পায় না।

সুরাইয়ার সঙ্গে কখনও কেউ দেখা করতে আসে না। অন্তত আজ পর্যন্ত আসেনি।

তার অবসর সময় কাটে রোমান্টিক বই পড়ে, কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে গান শুনে, আর পায়চারি করে।

আজ তিনদিন হলো স্যালামেসে এসেছে রানা, সুরাইয়ার গান শুনেছে চারবার। তার আচরণ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, মারাত্মক কোনও বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে সে।

রাতে সিদ্ধান্ত নিল রানা, বিসিআই সেটআপ থেকে গ্রিন সিগনাল পাওয়া গেলে কালই সুরাইয়ার সঙ্গে দেখা করবে ও। গান শেষ হওয়ার পর, সরাসরি তার তিন তলার স্যুইটে।

# তিন

ইয়ট ফরচুনা। গভীর সাগর।

সেল ফোনে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করল রানা। এটা বিসিআই চিফ, ওর বস্ রাহাত খানের নম্বর। তাঁকে রিপোর্ট করল রানা, 'মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ঘোরাফেরা করছে এদিকে। কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না, সার।'

বস বললেন, 'ওদের কাজ ওদেরকে করতে দাও।' মাত্র দু'এক কথায় একটা ধারণা দিলেন কী করছে ওরা, তারপর যোগাযোগ কেটে দিলেন।

ট্যুরিস্টের কাভার ঠিক রাখবার জন্য গভীর সাগরে মাছ ধরতে এসেছে রানা। কিছু মাছ ধরাও হলো। তারপর ফিশিং রড কাফ্রি সরদারকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকল ও, মেডিটেশনে বসবে।

ঠিক দু'ঘণ্টা পর গভীর ধ্যান শেষ হলো রানার। প্রশান্ত ও তাজা একটা ভাব নিয়ে কেবিন থেকে বেরুচ্ছে, কাফ্রি সরদার মাথা চুলকে বলল, 'মিস্টার রানা, একটা ঝামেলা হয়েছে।'

'কী ঝামেলা?'

'কথার কথা হিসেবে মিস্টার মেনদেরেসকে মাছ ধরার দাওয়াত দিয়েছিলেন আপনি, মনে আছে তো? ভদ্রলোক সেটাকে

সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছেন। খানিক আগে একটা বোট তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'তাই?' হেসে ফেলল রানা, তারপর ডেকে চোখ বুলাল। 'কোথায় তিনি?'

'খানিক আগে রিফ-এ গেছেন, স্পিয়ার দিয়ে মাছ ধরবেন।'

'একা?'

মাথা ঝাঁকাল কাফ্রি সরদার। 'মানা করেছি, কিন্তু আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন।'

'আমাকে ডাকতে পারতেন,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, কন্ট্রোল কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে এসে সাগরের উপর চোখ বুলাল।

মাইলখানেক দূরে জোড়া মাস্তুল সহ একটা ইয়ট দেখা গেল, পোল-এর মাথায় পতপত করে তুর্কি পতাকা উড়ছে, পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে স্যালামেস বন্দরের দিকে। তারপর রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল ছোট একটা সিপ্লেন। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে আসছে ওটা, রোদ লাগায় ঝলসে উঠল রুপালি ও নীল ফিউযিলাজ।

'চলতি মরশুমে বৈরুত থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট নিয়ে আসছে রাহি সামদানি,' কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এসে রানার হাতে কফি ভর্তি একটা মগ ধরিয়ে দিল কাফ্রি সরদার, ধোঁয়া উঠছে সেটা থেকে। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে আবার সিপ্লেনটার দিকে তাকাল। 'খুব ভাল আয় করছে।' আয়েশ করে চুমুক দিল নিজের মগে, তারপর একটা চুরুট ধরাল।

'ওড়াচ্ছেও দু'হাতে,' বলল রানা। 'রোজ রাতে জুয়ার বোর্ডে যেভাবে হারছে...' কথাটা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল।

মগটা শেষ করল রানা। 'কী যেন নাম বললেন – আদনান মেনদেরেস। ভদ্রলোক একা গিয়ে কাজটা ভাল করেননি।'

'যাই, দেখছি আমি,' বলে কেবিনে ঢুকে অ্যাকুয়ালাঙ নিয়ে

এল কাফ্রি সরদার।

'আপনি গেলে বোট দেখবে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাও তো ঠিক,' বলল সর্দার। 'তা হলে আপনাকেই যেতে হয়। অ্যাকুয়ালাঙ পরতে রানাকে সাহায্য করল সে, স্ট্র্যাপগুলো জায়গামত আটকে দিচ্ছে।

'স্পিয়ার গান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল সরদার। 'আমি একটা ভেঙে রেখেছি, মেরামত করা হয়নি। আরেকটা মিস্টার মেনদেরেস নিয়ে গেছেন।'

'এতক্ষণে বোধহয় ওটা দিয়ে নিজের পা ফুটো করে ফেলেছেন,' বলল রানা, ডাইভিং মাস্কটা মুখে পরে লাফিয়ে পড়ল স্বচ্ছ পানিতে। এক মুহূর্ত থেমে এয়ার সাপ্লাই অ্যাডজাস্ট করল, তারপর তির্যক একটা পথ ধরে নামতে শুরু করল পানির গভীরে।

শব্দহীন পরিবেশে একা ভেসে বেড়াতে দারুণ লাগে। ঢেউয়ে বাধা পাওয়ায় বাঁকা হয়ে নীচে নেমেছে রোদ। সাগরের মেঝেতে ঝলমলে কার্পেটের মত বিছানো রয়েছে সবুজ ঘাস, তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক রংবেরঙের মাছ। ফাঁকা জায়গায় বালির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল স্টারফিশ।

রিফটা আসলে বিচিত্র ভঙ্গিতে মোচড় খাওয়া ও বিদঘুটে আকৃতির প্রবাল দিয়ে তৈরি একটা জঙ্গল। কোথাও অপূর্ব সুন্দর, কোথাও রীতিমত কুৎসিত, আবার কোথাও এত ধারালো যে, মারাত্মক বিপজ্জনক।

প্রবালের একটা ঝোপের ভিতর বড়সড় কয়েকটা রুপালি মাদামোয়াযেলকে দেখা গেল, পরস্পরকে ধাওয়া করছে। একটু থেমে ওগুলোকে দেখল রানা, তারপর ফিন লাগানো পা দুটো জোরে ছুঁড়ে সামনে এগোল, ওকে এড়াবার জন্য ছিটকে দূরে সরে গেল মাছগুলো।

প্রবাল জঙ্গলের পিছনে সাগরের তলা অদৃশ্য হয়ে গেছে। গভীর পানিতে এক ঝাঁক রেইনবো ফিশ গাঢ় নীল বিস্তৃতি দখল

করে রেখেছে, ঝলমলে মেঘের আকৃতি নিয়ে কখনও নীচে নামছে, কখনও উপরে উঠছে, প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে বদলে যাচ্ছে প্রতিটি মাছের রঙ। আশ্চর্য এক দৃশ্য!

কয়েকটা নীল ম্যাকরলকে ধাওয়া করছে একটা হাঙর, হঠাৎ দিক বদলে রেইনবোর ঝাঁকে ঢুকে পড়ল ওগুলো। ঝাঁকটা বিস্ফোরিত হয়ে অসংখ্য রুপালি মেঘে পরিণত হলো। অকস্মাৎ একটা হাত হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিল রানাকে, পরমুহূর্তে ওর গা ঘেঁষে ছুটে গেল প্রকাণ্ড হাঙরটা। রানা ধারণা করল নিশ্চয়ই ওটা মেনদেরেসেরই হাত হবে।

খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে চওড়া একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে, সেটার কিনারা ধরে বিশ সেকেন্ড বিশ্রাম নিল রানা। ফাটলের ভিতরটা ঝাপসা, যেন সবুজ কুয়াশা ঝুলে আছে। ওদিক থেকে সাঁতরে বেরিয়ে এলেন আদনান মেনদেরেস, তারপর মুখ তুলে উপরদিকে তাকালেন।

তাঁর এক হাতে হার্পুন গান, অপর হাতের স্পিয়ারে গাঁথা রয়েছে একটা মাদামোয়াযেল। তাঁর দিকে এগোচ্ছে রানা, পানির গায়ে হেলান দেওয়ার ভঙ্গিতে পোজ নিলেন ভদ্রলোক, মাছটা নেড়ে দেখালেন ওকে। তাঁর ডান কাঁধের কাছে বেশ খানিকটা রক্ত ঠিক যেন খয়েরি মেঘ হয়ে ঝুলে আছে, লম্বা কয়েকটা ফিতের আকৃতি নিয়ে ভেসে যাচ্ছে নীল পানির ভিতর দিয়ে। আরও কাছাকাছি হওয়ার পর রানা দেখল মেনদেরেসের ডান হাতের উপরদিকটা খুব খারাপ ভাবে চিরে গেছে। সন্দেহ নেই প্রবালে ঘষা লাগার ফল।

হাসলেন মেনদেরেস, যেন মারাত্মক কিছু নয় বলে আশ্বস্ত করতে চাইলেন রানাকে। পরমুহূর্তেই তাঁর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। পিছন ফিরতে যাবে রানা, প্রচণ্ড শক্তিতে কী যেন ধাক্কা খেল ওর পিঠে, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ছিটকে পড়ল শরীরটা।

নীল ও রুপালি একটা ঝলক সচেতন করে তুলল রানাকে,

ঘাড় ফেরাতে দেখল সবুজ কুয়াশার ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে একটা আট ফুটি ব্যারাকুডা।

হঠাৎ ভয় পাওয়ায় মেনদেরেসের হাত থেকে স্পিয়ার গান ছুটে গেছে, পিছনে রিকভারি লাইন নিয়ে সাগরের গভীরে নেমে যাচ্ছে সেটা।

তাড়াতাড়ি সেদিকে ডাইভ দিল রানা। লাইনটা খপ করে ধরে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে গানটাকে। দ্রুত রিলোড করবার সময় দেখল সরু একটা ফাটলের ভিতর সেঁধোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন মেনদেরেস।

এতক্ষণে সবুজ কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এল ব্যারাকুডা, পজিশন নিল মেনদেরেসের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে। এক সেকেন্ড পর ওটার পাশে আরেকটা হাজির হলো। রক্তের গন্ধ পেয়ে মেনদেরেসকে ধরতে এসেছে ওগুলো। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন ভদ্রলোক একা আসাটা তাঁর মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

ভাসমান খয়েরি রক্তের মেঘ আকারে আরও বড় হচ্ছে। রানা জানে এই রক্ত আরও হিংস্র মাছকে ডেকে আনবে। ফিন পরা পা ছুঁড়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল ও, সেই সঙ্গে কাছাকাছি ব্যারাকুডার সাদা পেট লক্ষ্য করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ফায়ার করল।

ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে ব্যারাকুডা, ঝাঁকি লাগায় রানার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। শরীরটাকে গড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে পাক খাচ্ছে আহত মাছ, লেজের অবিরাম বাড়ি লাগায় আরও লাল হয়ে উঠছে পানি।

মেনদেরেসের দিকে এগিয়ে এল রানা, টেনে তাঁকে বের করল ফাটলের মুখ থেকে। ওরা ঘুরছে, দেখল দ্বিতীয় ব্যারাকুডা তার সঙ্গীর পাশে চলে এসেছে, নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ায় ভিতরে ভয়ালদর্শন দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। পানিতে তীব্র আলোড়ন ও কম্পন উঠল, বুদ্বুদ সরে যেতে দেখা গেল মাংসের

ফালি ও হাড় ঝুলছে ওটার মুখ থেকে।

সবুজ কুয়াশার ভিতর থেকে রুপালি আরও মাছ উঠে আসছে। তাড়াতাড়ি মেনদেরেসের একটা বাহু খামচে ধরল রানা, তাঁকে নিয়ে উঠে আসছে সারফেসে।

অগভীর পানিতে সরে এল ওরা, প্রবালের উপর দিয়ে সাঁতরাচ্ছে। খানিক পর মাথার উপর ফরচুনার খোল দেখা গেল। সেটার পিছনে, সারফেসে মাথা তুলল দুজন।

মই বেয়ে প্রথমে উপরে উঠলেন মেনদেরেস, রেলিং টপকাতে তাঁকে সাহায্য করল কাফ্রি সরদার।

ডেকে উঠে এসে মাস্ক ও অ্যাকুয়ালাঙ খুলছে রানা, দেখল চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছেন মেনদেরেস, চোখ দুটো বন্ধ। রীতিমত রাগ হচ্ছে ওর, বলল, 'আপনার জানা ছিল না স্পিয়ার ফিশিং-এর সময় শরীর থেকে রক্ত বেরুলে কী হতে পারে?'

'ছিল,' চোখ মেলে বললেন সিরিয়ান ভদ্রলোক। 'তবে শুনে শেখা ও ঠেকে শেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্বাস করুন, আমার জন্মের শিক্ষা হয়ে গেছে। ধন্যবাদ, মিস্টার রানা – মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। দ্বীপে ফিরে আপনাকে আমি শিভাস রিগাল খাওয়াব।'

'বাহ্, চমৎকার! তা হলে শোধবোধ হয়ে গেল,' বলল রানা। 'আপনাকেও ধন্যবাদ, হাঙরের পথ থেকে আমাকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে।' তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। 'চলুন নীচে যাই, আপনার কাঁধে ব্যান্ডেজ করতে হবে। গিয়ারগুলো সরদার তুলে রাখবে।'

পা ঝুলিয়ে একটা বাঙ্কের কিনারায় বসেছেন মেনদেরেস, কাঁধে একটা তোয়ালে, একটু একটু কাঁপছেন। একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। চুমুক দিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক।

রানা বলল, 'আরেকটা কথা। ব্যবহার করার পর সব সময়

রিলোড করতে হবে স্পিয়ার গান, কারণ কেউ বলতে পারে না আবার কখন ওটা আপনার দরকার হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন মেনদেরেস। 'দেখা যাচ্ছে, ইয়াং ম্যান, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে আমার।'

'নিশ্চই আমারও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে,' বলে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। 'এখনই রওনা হলে সন্ধ্যার কাছাকাছি স্যালামেসে পৌঁছাতে পারব আমরা।'

'জী।'

'মিস্টার সালেভান!' ডাকল রানা। 'চলুন ফিরি।'

হুইলহাউসে ঢুকে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কাফ্রি সরদার। এক মুহূর্ত পর থ্রটল খুলে দিয়ে ফ্যামাগুস্তা বে-র দিকে ঘুরিয়ে নিল ফরচুনাকে।

পুব দিগন্তে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বোধহয় একটা ঝড় আসবে।

সন্ধে ঠিক সাতটায় হারবারে পৌঁছে পুবদিকের পাথুরে জেটিতে ইয়ট ভিড়াল কাফ্রি সরদার। তরুণ তুর্কি পুলিশ অফিসার এনভার নেকমেতিন নিচু পাঁচিলে বসে চুরুট খাচ্ছিল, সিধে হয়ে কাফ্রি সরদারের ছুঁড়ে দেওয়া রশিটা খপ করে ধরে ফেলল।

ইতোমধ্যে বাতাসের গতি বেড়ে গেছে, সাগর হয়ে উঠছে উত্তাল। চেয়ারের পিঠ থেকে জ্যাকেটটা নিল রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছেন মেনদেরেস। মরচে ধরা লোহার মই বেয়ে জেটিতে উঠল ওরা।

সার্জেন্ট নেকমেতিন জানতে চাইল, 'কিছু পেলেন, মিস্টার রানা?'

'অল্প কয়েকটা।'

'গায়ে ইউনিফর্ম দেখছি না – চলুন, সার্জেন্ট, আপনিও

আমাদের সঙ্গে গলা ভেজাবেন,' আমন্ত্রণ জানালেন মেনদেরেস।

'সাদা পোশাকে ডিউটিতে আছি, মিস্টার মেনদেরেস,' বলল সার্জেন্ট নেকমেতিন। 'পরে।'

তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল কাফ্রি সরদার। জেটি ধরে সামনে এগোচ্ছে রানা, ওর পিছু নিলেন মেনদেরেস।

জেটি থেকে সোজা বিচ ক্লাব কেয়ার ফ্রিতে চলে এল ওরা। কিছুক্ষণ আগে প্রথম অনুষ্ঠান শেষ করেছে সুরাইয়া, প্রস্তুতি চলছে দ্বিতীয়টার। ডান্স ফ্লোরটা যথেষ্ট বড়, তারপরেও টেবিলগুলো খুব কাছাকাছি ফেলা হয়েছে।

একটা টেবিলও খালি পাওয়া গেল না। অগত্যা বার-এ বসল ওরা, রাহি সামদানির পাশে। তার জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খোলা, চোখে-মুখে বেপরোয়া ভাব, হাতে খালি হয়ে আসা একটা গ্লাস।

রানাকে দেখে হাসল তরুণ পাইলট। 'বিকেলে খোলা সাগরে দেখলাম আপনাকে। কিছু পেলেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার ব্যবসা কেমন?'

'অভিযোগ করলে আল্লাহ বেজার হবেন। বৈরুত থেকে আজ ফুল লোড নিয়ে এসেছি।'

'মিস্টার রানাকে হুইস্কি খাওয়াচ্ছি, আপনিও আমন্ত্রিত,' তাকে বললেন মেনদেরেস।

গ্লাসটা এক ঢোকে খালি করে টুল ছাড়ল সামদানি। 'ধন্যবাদ, আরেকদিন।'

'আরে, বসুন, বসুন!' বললেন মেনদেরেস। 'এত ব্যস্ততা কীসের?'

'রিফুয়েলিঙের জন্যে এক্ষুনি এয়ারপোর্টে যেতে হচ্ছে,' বলল সামদানি।

'এবার কোথায় চললেন, বৈরুতে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, কিছু লোককে বৈরুতে নিয়ে যাচ্ছি, ওখান থেকে তারা

মাঝরাতে লিবিয়ার ফ্লাইট ধরবে।'

'ও, তা হলে তো আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়া উচিত হবে না আমাদের,' বলল রানা।

'মিস্টার মেনদেরেস, প্লিজ,' অনুরোধ করল সামদানি। 'সুযোগ পেলে দিলরুবাকে বলবেন – দুঃখিত, ওর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা মিস করলাম আমি।'

'ঠি-ঠিক আছে,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বললেন মেনদেরেস।

সামদানি বিদায় নিয়ে চলে যেতেই সরাসরি মেনদেরেসের দিকে তাকাল রানা। 'আপনার সঙ্গে তা হলে দিলরুবার পরিচয় আছে?' শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, মিস্টার সামদানি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন,' হাসিমুখে বললেন সিরিয়ান এসপিওনাজ এজেন্ট, তারপর বারম্যানকে ডেকে হুইস্কির দাম মেটালেন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। রানার দিকে ফিরে আবার বললেন, 'স্যুইটে ফিরে আমি এখন শাওয়ার সারব। তারপর আমরা হয়তো একসঙ্গে ডিনার খেতে পারি, কী বলেন?'

'ধন্যবাদ,' বলে মাথা নাড়ল রানা। 'আজ নয়।'

'নতুন একটা হার্পুন গান পাওনা হয়েছে কাফ্রি সরদারের,' বললেন মেনদেরেস। 'ভাবছি কাল কোনও এক সময় দিয়ে আসব।'

'সকালের দিকে যেতে পারেন, এই আটটার দিকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

হুইস্কির গ্লাসে মাত্র চুমুক দিয়েছে রানা, এই সময় ড্রিম ড্রিম শব্দে ড্রাম বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা হয়ে গেল ডান্স ফ্লোর। চারপাশের আলো ম্লান হয়ে এল। ব্যান্ড-এর পাশে খিলানের নীচে স্থির হলো একটা স্পটলাইটের বৃত্তাকার আলো।

রঙচঙে পুঁতি দিয়ে বানানো পরদা সরিয়ে ডান্স ফ্লোরে ঢুকছে সুরাইয়া, হঠাৎ পিন-পতন নীরবতা নেমে এল ক্যাসিনোর ভিতর।

কালো জিন্সের ট্রাউজার পরেছে সে, সাদা সিল্ক শার্ট দিয়ে গিঁট মেরেছে কোমরে, মাথার কর্ডোভান হ্যাট খানিক বাঁকা হয়ে ছায়া ফেলেছে তার মুখে। নাভীর কাছে ঝুলছে স্লিঙে বাঁধা গিটার।

এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল সুরাইয়া, কীসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে, তারপর তার আঙুল গিটারের তারে মৃদু টোকা দিল, সেই সঙ্গে মধুর সুরে ধরল গান।

সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, গলার এই অপূর্ব মাধুর্য নিয়ে একদিন গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গায়িকাদের সারিতে দাঁড়াতে পারবে সুরাইয়া। তবে নিশ্চয়ই কোথাও একটা বাধা আছে, তা না হলে রয়াল অ্যালবার্ট হল-এর সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকত না ও কিছুতেই।

সুরাইয়ার বিপদটাকে মোটেও ছোট করে দেখছে না রানা।

পরপর দুটো গান গেয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছে সুরাইয়া, শ্রোতাদের করতালিতে গোটা ক্যাসিনো যেন ফেটে পড়তে চাইল।

খিলানের কাছে পৌঁছে থামল সুন্দরী গায়িকা, ঘুরল, শ্রোতাদের উপর চোখ বুলাচ্ছে ধীরে ধীরে। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি। হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করল রানা, উত্তরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। সন্দেহ নেই ওকে চিনতে পেরেছে সে।

সুরাইয়া চলে যাওয়ার পর নেপথ্যে রবাব বেজে উঠল, সেই সঙ্গে ফ্লোরে হাজির হলো একদল নর্তকী।

টুল ছাড়ল রানা, ক্যাসিনো সেকশনে যাওয়ার জন্য ভিড় ঠেলে একটা দরজার দিকে এগোল।

ক্যাসিনোয় ঢুকে ভিতরে প্রচুর ভিড় দেখল রানা, রুলেত-এর একটা টেবিলও খালি নেই। আজ রোববার, ছুটির দিন, ভাবল ও। সেই সঙ্গে মনে পড়ল আজ মাঝরাতেও একটা অনুষ্ঠান আছে সুরাইয়ার।

রিসেপশনকে পাশ কাটিয়ে এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে রানা, উল্টোদিক থেকে আসতে দেখা গেল কেয়ার ফ্রির মালিক জার্মান জিমি মোরেলকে। অমায়িক হেসে ওর পথ আগলালেন তিনি। 'আসুন, হের রানা, কোথাও বসে একটু গলা ভেজাই। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ইতস্তত করছে রানা। 'বলুন, কী কথা।'

রানার হাত ধরে একপাশে সরিয়ে আনলেন মোরেল। 'আপনি কি ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল?' নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন কেউ তাঁর কথা শুনছে কি না।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'কেন বলুন তো? হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন?'

'জ্ঞানী-গুণী কয়েকজন ফিলিস্তিনি আসতে চান,' বললেন জার্মান মোরেল। 'আমার প্রশ্ন হলো, তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি কি না?'

'এরকম অবাস্তব কথা আপনার মাথায় এল কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'অবাস্তব হতে যাবে কেন? মানুষ মানুষের জন্য। মানুষের প্রতি মানুষের দরদ থাকবে না?'

চুপ করে তাকিয়ে আছে রানা।

'আপনারা মুসলমান নন? ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্যে আপনাদের কিছু করা উচিত নয়?' আবার বললেন মোরেল, তাঁর নরম সুরে একটু যেন তিরস্কার।

'ওদের জলসীমায় সারাক্ষণ টহল দিচ্ছে পেট্রল বোট... '

'আমরা সাহায্য করব জানলে তারা ওগুলোকে ফাঁকি দিয়ে সাগর পাড়ি দিতে রাজি আছে...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'তারপরেও মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে।'

'এত বড় একটা মহৎ কাজ করতে গেলে ঝুঁকি ছাড়া কি হয়?'

হাসলেন মোরেল। 'তবে ওদেরকে সাগর থেকে তোলার কাজটা নিজেরা না করে অন্য লোকদের দিয়েও করানো যায়।'

'আপনার এত আগ্রহের কারণ কী বলুন তো?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'আপনি জার্মান, ফিলিস্তিনি বা মুসলমান নন।'

'তা নই, তবে ছোটবেলায় আমিও ওদের মত শরণার্থী ছিলাম – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। রিফিউজি ক্যাম্পের জীবন যে কেমন করুণ হতে পারে, আমার খুব ভাল করে জানা আছে। সেজন্যেই ওদের জন্যে এতোটা ফিল করি আমি।'

মোরেলের কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা।

'হের রানা, ভাববেন না জুয়া খেলিয়ে আয় করি বলে আমার ভেতর মনুষ্যত্বও শেষ হয়ে গেছে,' বললেন মোরেল। 'ফ্যামাগুস্তায় আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদের ওয়েলফেয়ার ফান্ডে আমি নিয়মিত চাঁদা দিই।'

'এ নিয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব, কেমন?' মোরেলকে পাশ কাটিয়ে নিজের পথে রওনা হয়ে গেল রানা।

'প্রস্তাবটা কিন্তু বিবেচনা করে দেখবেন, প্লিজ,' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বললেন মোরেল। 'আপনারা রাজি থাকলে লোক যোগাড় করার দায়িত্ব আমার।'

যেমনটি আশা করেছে রানা, নিজের স্যুইটে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল সুরাইয়া। নক করতে কেউ সাড়া না দিলেও, দরজাটা নিজে থেকেই একটু ফাঁক হলো। কবাটে হাত রেখে চাপ দিল ও, এবার পুরোপুরি খুলে গেল ওটা।

ভিতরে ঢুকল রানা। ছোট্ট প্যাসেজ, সরাসরি সামনে ড্রইং রুমের খোলা দরজা, একটা সোফার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপা বেদুঈন কন্যা।

# চার

তার এই ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারাও এত সুন্দর যে, হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে ও।

এখনও জিনসের ট্রাউজার ও সাদা সিল্ক শার্ট পরে রয়েছে সুরাইয়া, মাথায় কর্ডোভান হ্যাট। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, টান টান; কপালে ও ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু জমা ঘাম টিউবের সাদা আলোয় চিকচিক করছে।

প্যাসেজ পার হয়ে কামরার ভিতর ঢুকছে রানা, ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল সুরাইয়া। তারপর চোখের ইশারায় ওকে কাছে আসতে বলল।

'মাইক্রোফোন,' রানা কাছাকাছি আসতে ফিসফিস করল সুরাইয়া। একটু ঘুরে ঝুঁকল সে, টেবিলের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা যান্ত্রিক ছারপোকা বের করে আনল। সিধে হওয়ার সময় রানার পাঁজরের সঙ্গে মৃদু ঘষা খেল বুক। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীর, রক্তিম আভা ফুটল মুখে। হাত নেড়ে গোটা স্যুইটটা দেখিয়ে আবার বলল, 'সব জায়গায়।' দুজন এত কাছে চলে এসেছে যে একজন আরেকজনের নিঃশ্বাসের আঁচ পাচ্ছে।

সুরাইয়ার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। আমেরিকার তৈরি, সাধারণত ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স

মোসাদ ব্যবহার করে এগুলো। নিচু হয়ে টেবিলের তলায়, আঠার সঙ্গে আটকে দিল সেটা।

সিধে হয়ে ফিসফিস করল ও, 'আমার স্যুইটে, কেমন? চলুন, একসঙ্গে বেরুই।'

উদ্বিগ্ন ও অস্থির দেখাচ্ছে সুরাইয়াকে, রানার কাঁধে হাত রেখে যেন ভরসা পাওয়ার চেষ্টা করল। 'নিরাপদ তো?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

অভয় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

উঁকি দিয়ে করিডরটা দেখে নিয়ে একসঙ্গে বেরুল ওরা, রানার বাহু প্রায় খামচে ধরেছে সুরাইয়া। ধাপ বেয়ে তিনতলা থেকে চারতলায় ওঠার সময় রানার গা ঘেঁষে থাকল সে – গরম একটা অনুভূতি হলো রানার। সিঁড়িতে বা চারতলার করিডরে কারও সঙ্গে ওদের দেখা হলো না।

নিজের স্যুইটের সামনে এসে ঝুঁকল রানা, তালার ফুটোয় চোখ রাখল। ভিতরে সাদা মত কী একটা রয়েছে দেখে স্বস্তি বোধ করল।

তালাটা কেউ খোলার চেষ্টা করলে মসুর-ডালের মত মোমের টুকরোটা ওখানে থাকত না।

সুরাইয়াকে নিয়ে নিজের স্যুইটে ঢুকল রানা। আলো জ্বালার পর দরজা বন্ধ করছে, অনুভব করল ওর পাশে দাঁড়িয়ে একটু একটু কাঁপছে মেয়েটি।

ঘুরে তার দিকে তাকাল রানা। চোখ বন্ধ করে আছে সুরাইয়া, ঘামছে, হাঁপাচ্ছেও। তাকে ডাবল সোফার দিকে নিয়ে এল ও। ওখানে বসিয়ে সরে আসতে যাবে, কাঁপা হাতে ওর একটা হাত ধরে ফেলল সুরাইয়া।

'এখানে আপনার কোনও ভয় নেই,' বলল রানা। 'শান্ত হয়ে একটু বসুন,' বলল ও, 'আমি আপনার জন্যে গরম কফি বানিয়ে আনি।'

‘না!’ ওকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল সুরাইয়া, ফলে বাধ্য হয়ে তার পাশে বসতে হলো রানাকে, গা ঘেঁষে।

‘বললাম তো, এখানে আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই...’

এই সময় খেয়াল হলো সুরাইয়ার, রানাকে প্রায় নিজের গায়ের উপর টেনে এনেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীরটা, তারপর চেষ্টা করল সরে যেতে। বিড়বিড় করে বলল, ‘ঠিক আছে... কফি বানাতে যাবেন বলছিলেন, ভয় পাব না আমি, আপনি যান।’

‘একটু পরেই না হয় যাই,’ বলল রানা।

‘ন্না, প্লিজ!’

তার চিবুকটা দু’আঙুলে ধরে মুখটা নিজের দিকে ফেরাল রানা, তারপর নরম সুরে বলল, ‘আপনাকে যে আমার অসম্ভব ভাল লেগেছে সেটা আমি নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনি এখনও কোনও জবাব দেননি...’

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সুরাইয়া। তারপর আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, ‘কোনওদিনই আমি কাউকে ভালবাসতে পারব না।’

হকচকিয়ে গেল রানা। ‘মানে? কেন?’

‘সব প্রশ্নের জবাব হয় না, রানা!’ ফিসফিস করল সুরাইয়া।

অপরূপার চিবুক থেকে আঙুল সরিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে রানা, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সুরাইয়া, হঠাৎ তার কী হলো, ওর চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমগ্র অস্তিত্বের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে চুমো খাচ্ছে ওকে। ফোঁপাচ্ছে। বিড়বিড় করে বলছে, ‘ভালবাসি! সত্যি ভালবাসি! জানি উচিত নয়, স্রেফ পাগলামি, তবু ...তবু আমি তোমাকেই ভালবাসি!’

‘উচিত নয়? কেন উচিত নয়?’ নরম হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। ‘সব কথা খুলে বলো আমাকে, সুরাইয়া।’ গভীর আগ্রহ নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে বেদুঈন কন্যার দিকে তাকিয়ে

আছে। 'অ্যালবার্ট হলের ওই অনুষ্ঠানে যাওনি কেন তুমি? বিরাট একটা সুযোগ ছিল ওটা, অথচ সব ফেলে তুমি পালিয়ে এলে ...কেন?'

রানার মুখে চোখ বুলিয়ে কী যেন খুঁজল সুরাইয়া, তারপর মৃদু সুরে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে কাজটা আমি ভাল করেছি কি না। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তোমার যদি কিছু হয়ে যায়...'

সুরাইয়ার ভয় দূর করবার চেষ্টা করল রানা। জানাল, যাদের কাছে প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারবে, এমন লোক আছে ওর আশপাশেই, কেউ ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

আশ্বস্ত হয়ে শুরু করল সুরাইয়া।

আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে ছিল সে, একটা খ্রিশ্চান মিশনারি স্কুলে। ওখান থেকে তাকে লন্ডনের যে কলেজটায় পাঠানো হয়, সেখানে ছিল ছয় বছর। ওখান থেকেই পারফর্মিং আর্টস-এ অনার্স করেছে।

অনার্স পাস করতে যখন দেড় বছর বাকি, হঠাৎ ওই কলেজ সম্পর্কে কিছু গোপন তথ্য জেনে ফেলে সুরাইয়া। সে যে জানে, এটা এতদিন পর হঠাৎ টের পেয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, ফলে তাকে কিডন্যাপ করার জন্যে লোক পাঠায় তারা, তাই ইংল্যান্ড ছেড়ে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

'কী তথ্য?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'আমি জানতে পারি, কলেজের ব্রাদার ও ফাদাররা কেউই আসলে খ্রিশ্চান নয়,' বলল সুরাইয়া। 'ওটা মোসাদ-এর একটা গোপন শাখা। সবাই তারা ছদ্মবেশী মোসাদ এজেন্ট, ইহুদি।'

তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'ওদের কাজটা কী?'

'এই কলেজের কাজ হলো কারণে-অকারণে ইউরোপ-আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানা, এবং সেই সঙ্গে প্রচার করা যে কাজগুলো হামাস, হিযবুলাহ, আল ফাত্তাহ্ বা আল কায়েদা

করেছে। তাদের এই একটাই কাজ, দুনিয়ার মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে মুসলমানরা ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী, দুনিয়ার অন্যান্য শান্তিপ্রিয় ধর্মাবলম্বীদের শত্রু।'

রানার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। 'এরকম দু'একটা ঘটনার কথা বলতে পারবে তুমি?'

'হ্যাঁ, কেন পারব না। তবে বিশ্বাস করা না-করা তোমার ব্যাপার,' বলল সুরাইয়া। 'ব্রিটেনের পাতাল রেলে যে বোমা ফাটানো হয়েছে সেগুলো ওদের কাজ। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসে গ্রেনেড ছোঁড়ার কাজটাও। তা ছাড়া, নাইন/ ইলেভেন-এর ঘটনা ইজরায়েল আগে থেকেই জানত, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু না বলে ওইদিন টুইন টাওয়ার থেকে দূরে থাকার জন্যে বেছে বেছে শুধু ইহুদিদেরকেই নির্দেশ দিয়েছে তারা। ফলে সময়মত খবর না পাওয়ায় ওই প্লেন হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মাত্র একজন ইহুদি মারা গেছে।'

অভিযোগটা আগেও শুনেছে রানা, তবে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আর সবার মত ওরও বিশ্বাস হয়নি। 'কিন্তু কীভাবে? কোনও প্রমাণ আছে?'

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে শুরু করল সুরাইয়া। কমপিউটারে কাজ করছে, এই সময় দৈবাৎ ওদের একটা ডেটা ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে একটা চিঠি ছিল, তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, নাইন/ইলেভেনের দিন একজন ইহুদিও যাতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে না থাকে।

সবাই জানে যে ঘটেছেও ঠিক তাই।

এরকম আরও বহু ডকুমেন্ট ওখানে দেখেছে সুরাইয়া। যেমন, ইজরায়েলি এক মন্ত্রী ইয়াসির আরাফাতকে বিষ খাইয়ে খুন করার জন্য তাগাদা দিয়েছে, বলেছে সেটা এমন বিষ হতে হবে কোনও টেস্টেই যেন ট্রেস করা না যায়।

ঠিক তাই কি ঘটেনি?

'এ-সব ডকুমেন্ট সম্পর্কে অনেক আগেই জেনেছ তুমি, তাই না?' প্রশ্ন করল রানা। 'কিন্তু তুমি যে জানো, এটা ওরা এতদিন পর ধরল কীভাবে?'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সুরাইয়া। কমপিউটারে এমন একটা শব্দ টাইপ করে ফেলে সে, যেটা ওদের ডেটা ব্যাঙ্কের অ্যাকসেস কোড ছিল। দৈবাৎ কোডটা ভাঙার পর কমপিউটার তাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি কে? কিছু না বুঝেই নিজের পরিচয় টাইপ করেছে সুরাইয়া। তার উচিত ছিল কমপিউটার বন্ধ করার আগে নিজের নামটা মুছে ফেলা।

এতদিন পর, সম্ভবত মাস চারেক আগে, অ্যাকসেস কোড ব্যবহার করে কলেজের কোনও মোসাদ এজেন্ট সিক্রেট ডেটা ব্যাঙ্ক ওপেন করেছে, অমনি তার চোখে পড়েছে সুরাইয়ার নাম – ওর আগে যে ওপেন করেছিল ফাইলটা।

ডকুমেন্টগুলো প্রকাশ করা হলে মোসাদ বিপদে পড়বে, তাই সিদ্ধান্ত নিতে মোটেও দেরি করেনি ওরা। রয়াল অ্যালবার্ট হলে আসবার পথে সুরাইয়াকে কিডন্যাপ করে ওরা। মোসাদের ধারণা: ডকুমেন্টগুলো শুধু দেখেইনি সুরাইয়া, কপিও করেছে। সেগুলো এখন ফেরত চাইছে।

চলন্ত গাড়িতেই জেরা করা হচ্ছিল সুরাইয়াকে, এক পর্যায়ে এজেন্টদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল তার বডিগার্ড ইউসুফ মোরদেজা। হঠাৎ একটা গুলি হলো, সুরাইয়া দেখল বুকে হাত চাপা দিয়ে স্থির হয়ে গেল ইউসুফ। মোসাদ এজেন্টরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এই ফাঁকে দরজা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছে সুরাইয়া। বোটে চড়ে টেমস নদী থেকে খোলা সাগরে চলে আসে সে, তারপর একটা লেবাননি জাহাজে ওঠে। পাসপোর্ট না থাকায় ঘুষ হিসাবে গায়ের সব গহনা খুলে দিতে হয় ক্যাপটেনকে। বৈরুত হয়ে সোজা স্যালামেস বন্দরে চলে এসেছে সে প্রথম সুযোগেই।

'তারপর প্রতিদিন টিভির নিউজ শুনেছি, পেপার পড়েছি,' ধরা গলায় বলল সুরাইয়া, 'কিন্তু ইউসুফের কোনও খবর পাইনি।' কোলের উপর রাখা হাতে টপ টপ করে চোখের পানি পড়ছে। 'শুধু আমাকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই ধস্তাধস্তি শুরু করেছিল ও। ওরা নিশ্চয়ই লাশটা গুম করে ফেলেছে...'

একটু ঝুঁকে সুরাইয়ার কাঁধে হাত রাখল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'এখানে আসার পর কি হলো?'

সান্ত্বনার ছোঁয়া পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুরাইয়া। এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে রানার গায়ে হেলান দিল সে, বলল, 'হপ্তা দুয়েক হলো সেই লোকগুলোকেই দেখতে পেলাম, এখানে, এই দ্বীপে, লন্ডনে যারা আমাকে কিডন্যাপ করতে যাচ্ছিল। বিশ্বস্ত এক লোক লন্ডনে যাচ্ছে শুনে সাহায্যের জন্যে তাই তোমাকেই মেসেজ পাঠালাম।'

সুরাইয়া থামার পরেও অনেকক্ষণ কিছু বলল না রানা।

'চুপ করে আছ যে?' এক সময় ফিসফিস করল সুরাইয়া, হাত দুটো খুঁজে নিল ওকে।

'কীভাবে কী করব ভাবছি।'

আরও কাছে সরে এসে রানার ঠোঁটে হাতচাপা দিল সুরাইয়া। চাপা গলায় বলল, 'যা করার কাল কোরো, এখন কোনও কথা নয়, কেমন? আজই আমার শেষ সুযোগ!' কথাটা ব্যাখ্যা না করে আবার চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল ওকে। ওর গালে ঘষছে গাল, বুক চেপে ধরছে বুকে। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠল রানা।

একসময় সাড়া দিল সে-ও।

ঘুম ভাঙার পরও অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে শুয়ে থাকল রানা, শুনতে পাচ্ছে বাইরে অবিরাম হাহাকার করছে ঝোড়ো বাতাস। খানিক পর একটা হাত বাড়াল, সুরাইয়ার স্পর্শ না পেয়ে বুঝল বিছানায় নেই ও।

গায়ের চাদর সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। বারোটা পনেরো। মনে পড়ল আজ রোববার, মাঝরাতে সুরাইয়ার একটা শো আছে। চলে যাওয়ার সময় ওর ঘুম ভাঙায়নি সে।

বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরল রানা। সাড়ে বারোটায় নীচে নেমে দেখল ক্যাসিনোয় এখনও কিছু লোক বসে আছে, তবে বার প্রায় খালি।

একটা উঁচু টুলে বসে হাতে বানানো সিগারেটে টান দিচ্ছেন আদনান মেনদেরেস, অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাচ্ছেন একটা ইয়টিং ম্যাগাজিনের। বাতাসে গাঁজার গন্ধ পেয়ে তাঁর হাতে ধরা সিগারেটের দিকে চট করে একবার তাকাল রানা।

মুখ তুলে রানাকে দেখে হাসলেন মেনদেরেস। 'হ্যালো, ইয়াং ম্যান।'

চোখ কুঁচকে খালি ডান্স ফ্লোরের দিকে তাকাল রানা। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? শো শেষ হলো কখন?'

'আজকের মিডনাইট শো তো হয়নি,' বললেন মেনদেরেস। 'বোধহয় বড় একটা ঝড় আসছে।' যেন তাঁর কথার সমর্থনেই দমকা একটা বাতাস ঝাঁকি দিল বন্ধ জানালায়।

ঘুরতে যাবে রানা, ওর ষষ্ঠইন্দ্রিয় কীসের যেন একটা আভাস অনুভব করছে, এই সময় একটা ক্যাশ বাক্স নিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এলেন জিমি মোরেল।

বার-এর পিছনে যাচ্ছেন মোরেল, তাঁর পথ আগলাল রানা। 'আপনি কিছু জানেন, হের মোরেল? শো কেন হয়নি? দিলরুবা কোথায়?'

'দিলরুবা ওরফে সুরাইয়া, তাই না?' ক্যাশ বাক্সটা বারের একটা সিন্দুকে রেখে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মোরেল। কী কারণে যেন রানার দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। 'আপনি বরং এক ঢোক হুইস্কি খান, হের রানা।'

জবাবে রানা কিছু বলবার আগেই বাইরে থেকে একটা

চিৎকার ভেসে এল। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো দরজা। সগর্জনে ভিতরে ঢুকল তীব্র বাতাস, আছড়ে পড়ল সামনের দেয়ালে।

হোঁচট খেয়ে ভিতরে ঢুকেছে এক বুড়ো লোক। কোথাও থেকে দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে সে, পরনের অয়েলস্কিন কোট থেকে পানি ঝরছে মেঝেতে। বার-এর কিনারা আঁকড়ে ধরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

বুড়োর নাম খিজির হায়াত, গভীর সাগরে মাছ ধরে, মরশুমের সময় একটা চার্টার বোটও চালায়।

বার-এর পিছনে চলে গিয়ে একটা গ্লাসে খানিকটা রাম ঢাললেন মোরেল, তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরলেন বুড়োর দিকে। 'এটুকু খেয়ে শান্ত হও, তারপর সংক্ষেপে বলো কী হয়েছে।'

'রাহি সামদানির ঝক্কড় মার্কা প্লেনটা সাগরে পড়ে গেছে।' খানিকটা রাম গিলে খক্-খক্ করে কাশল হায়াত। 'মাইল দুয়েক দূরে, আলমাস রিফ-এর কাছে ছিলাম আমি। সাগর ওদিকে এমন খেপাই খেপে আছে, কার সাধ্য আগে বাড়ে।'

'কী হয়েছে বলুন,' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনলাম। তাকাতেই দেখি আকাশ থেকে সরাসরি রিফের ওপর পড়ে যাচ্ছে প্লেনটা।'

'আপনি সাহায্য করতে যাননি?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ওই ঝক্করমার্কা, পুরনো বোট নিয়ে? সার, না দেখলে বুঝবেন না সাগর কেমন ফুঁসছে। জান নিয়ে যে এখানে খবর দিতে আসতে পেরেছি, সেটাই আমার ভাগ্য।'

হঠাৎ জোরে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল সবাই। হাত থেকে রাম-এর বোতলটা ফেলে দিয়েছেন মোরেল। সামান্য টলছেন তিনি, মুখটা সাদা হয়ে গেছে, বার ধরে স্থির করলেন নিজেকে।

'ফর গড'স সেক, শক্ত হোন,' তাঁকে বলল রানা। 'গায়ে একটা কোট চাপান, তারপর চলুন বেরোই।'

‘হের রানা, আপনি বুঝতে পারছেন না,’ বললেন মোরেল। ‘ওই প্লেনে দিলরুবা ওরফে আপনার সুরাইয়া ছিল।’

পাথর হয়ে গেল রানা। একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। একটা অসুস্থ, ঠাণ্ডা ভাব গ্রাস করে ফেলছে ওকে। ঠিক সেই মুহূর্তে কড়াৎ করে বজ্রপাতের আওয়াজের সঙ্গে আকাশ চিরে দিয়ে শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি।

# পাঁচ

হারবারের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সাগরের দিকে ঘুরে গেল ফরচুনা। থ্রটল খুলে দিল দৈত্যাকার কাফ্রি সরদার, বো উঁচু করে নতুন শক্তিতে বিরাট ঢেউগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা ইয়ট। সার্জেন্ট এনভার নেকমেতিনের পুলিশ লঞ্চটা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য একটা শান্ত ভাব চলে এসেছে রানার মধ্যে। খারাপ-ভাল সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলেছে ও, শুধু মনে রেখেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকুস্থলে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে, তবেই যদি কিছু করা যায়। কাফ্রি সরদার সালেভানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, প্রয়োজনে যাতে হুইল ধরতে পারে।

‘কতটুকু চান্স আছে ওদের?’ ওর আরেক পাশ থেকে জানতে চাইলেন মেনদেরেস।

‘প্রচুর,’ বলল রানা। ‘পুরানো হলে কী হবে, ওটা তো একটা ওয়ালরাস সিপ্লেন, ডুবতে যথেষ্ট সময় নেবে। তা ছাড়া, সামদানি

সেদিন বলছিল, তার প্লেনে সবসময় শুধু লাইফজ্যাকেট নয়, রাবারের ভেলাও থাকে।'

'রিফটা কেমন, যেখানে পড়েছে প্লেনটা?'

'সেটাই চিন্তার বিষয়,' জবাব দিল কাফ্রি সরদার।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বুড়ো খিজির হায়াত বলল, 'আবহাওয়া খারাপ থাকলে সাগর উদ্ভট আচরণ করে।'

একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে ফরচুনা, ছুটে এসে পাশে আঘাত করল জোরাল দমকা বাতাস। গোটা ইয়ট থরথর করে কেঁপে উঠল, ঢাল থেকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

মেনদেরেস ও হায়াত ছিটকে পড়ল একদিকে। সালেভানের মস্ত কাঁধ ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা।

খপ করে হুইল ধরে দ্রুত ঘোরাল সরদার, আরেকটা ঢেউ চলে আসবার আগেই সিধে করে নিল ফরচুনাকে।

কম্পাস হাউজিং-এর আলোয় অসুস্থ ও সন্ত্রস্ত দেখাল মেনদেরেসকে। সেলুনের দরজা খুলে গেল, আলো পড়ল বাইরে। কম্পানিয়নওয়ে ধরে উঠে আসছেন জিমি মোরেল, হাতে জগ ভর্তি কফি ও মগ। 'ওরেব্-বাপ, সাগর দেখছি সত্যি খেপেছে!'

'হের মোরেল, কেমন আছেন আপনি?' জানতে চাইলেন মেনদেরেস।

'যেমন থাকার কথা, খালি বমি আসছে,' বললেন মোরেল। 'আমার আসলে ডাঙাতেই থাকা আসা উচিত ছিল।'

মেঘ কেটে যাওয়ায় বৃষ্টি থেমেছে।

কফি এত গরম যে জিভ পুড়ে যাচ্ছে, তারপরও ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে রানা। লাল ও সবুজ নেভিগেশন লাইট অদ্ভুত আভা ফেলছে দুলন্ত ডেকের উপর। ইয়টের চারধারে শুধু আঁধার ও মাতাল সাগর ছাড়া আর কিছু নেই।

ছেঁড়া মেঘগুলো সরে যেতে চাঁদ উঠল, কিছু তারাও দেখা

দিল। বড় বড় ঢেউয়ের উপর দিয়ে অনায়াসে এগোচ্ছে ফরচুনা। তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অন্য রকম একটা গর্জন, একটু যেন ফাঁপা, সেই সঙ্গে চাঁদের আলোয় দেখা গেল সাদা পানির একটা ঝরনা পঞ্চাশ ফুট উঁচু হয়ে আছে।

'আরে, দেখুন তো, কী ওটা?' ঘাবড়ে যাওয়ায় বেসুরো শোনাল মেনদেরেসের কণ্ঠস্বর।

'ব্লো-হোল,' জানাল কাফ্রি সরদার।

'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইলেন মেসদেরেস।

'পানির নীচে পাহাড়-প্রাচীর আছে,' ব্যাখ্যা করছে সরদার। 'ওই প্রাচীরের গায়ে বিশাল একটা গর্ত আছে। গর্তটার উপরে ছাদ নেই, ফাঁকা, আকাশ দেখা যায়। খারাপ আবহাওয়ার সময় সাগরের পানি তীব্রবেগে গর্তে ঢুকে ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসলে এ রকম দেখায়। রিফের ভেতর দিকটা আসলে ফাঁপা।'

অকুস্থলে পৌঁছাচ্ছে ওরা। কথাবার্তা থেমে গেল। রিফের যে অংশটা পানির উপর মাথা তুলে আছে, সেটা দুর্গের কালো প্রাচীরের মত দেখতে, এবড়োখেবড়ো, ত্রিশ ফুট উঁচু। পানির নীচের একটা প্রবাহ টেনে নিতে চাইল ওদেরকে, তবে সরদার হুইল ঘুরিয়ে পোর্ট-এর দিকে বাঁক নিচ্ছে বলে কোনও বিপদ ঘটল না। অবশ্য ফরচুনার কিল-এর গায়ে চাপড় মারার ফাঁপা এক ধরনের শব্দ হলো। একদিকে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল পানি, ফেনা হয়ে উঠে যাচ্ছে অনেক উপরে; বাকি সবদিকে সাদাটে কী সব দেখা যাচ্ছে। ওগুলো এবড়োখেবড়ো পাথর, পানির উপর মাথা তুলে আছে।

থ্রটল বন্ধ। বড়সড়, সবুজ একটা পাথরের দিকে মন্থর বেগে ভেসে চলেছে ওরা। রিফের দক্ষিণ কোণ ঘুরছে ইয়ট। ওই দিকটায় বাতাস ও সাগরের অস্থিরতা অনেক কম হবে।

পানির উপর মাথা তোলা পাথর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখা যাচ্ছে সব। যতদূর দৃষ্টি যায়

কোথাও রাহি সামদানির সিপ্লেনের চিহ্নমাত্র নেই।

সামনের জানালাটা খুলল সরদার। স্পটলাইটের সুইচ অন করল রানা, ধীরে ধীরে একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাচ্ছে ওটা। পানির উপর দিয়ে রিফের দিকে এগোচ্ছে আলো।

উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল খিজির হায়াত, হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। রুপালি ফিউজিলাজের একটা অংশে স্পটলাইটের আলো পড়েছে। হুইলটা রানার হাতে ছেড়ে দিয়ে নোঙর ফেলার জন্য ইয়টের পিছনদিকে ছুটল সরদার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা।

মেনদেরেস ও হায়াত ডেকে বেরিয়ে গেছে। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে এগোচ্ছে রানা, হঠাৎ সিরিয়ান মিলিওনেয়ার আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলেন।

দ্রুত হুইলহাউসের মাথায় উঠে এল রানা, মেনদেরেসের দৃষ্টি অনুসরণ করে স্পটলাইটটা ঘোরাল। দৃশ্যটা দেখামাত্র মোচড় দিয়ে উঠল ওর পেট। এক টুকরো মাংস নিয়ে কুকুররা যেমন মারামারি করে, চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় ঠিক তেমনি উন্মত্ত আচরণ করছে কয়েক ডজন হাঙর। একটা রাক্ষসের কুৎসিত মাথা পানি ছেড়ে উপরে উঠল, দুই দাঁতের মাঝখানে আটকানো রয়েছে মানুষের ছিঁড়ে আনা একটা হাত।

লাফ দিয়ে ডেকে নেমে কেবিনের দিকে ছুটল রানা। একটু পরেই বেরিয়ে এল, হাতে একটা অটোমেটিক কারবাইন নিয়ে। রেইলের সামনে দাঁড়াল, হাঙরগুলোর চকচকে গা লক্ষ্য করে একের পর এক ফায়ার করছে।

আহত হাঙরগুলো মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট শুরু করল, চারদিকে পানি ছিটাচ্ছে। আশপাশের সাগর লাল হয়ে উঠল। এদিক সেদিক ভেসে যাচ্ছে কাঁচা মাংসের টুকরো ও ফালি। এক মিনিট পর থামল রানা, কোনও লাভ হবে না জেনে অসহায় বোধ করছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

হাতের খালি রাইফেলটা ডেকে ফেলে দিল রানা, এলোমেলো পা ফেলে নীচে নেমে গেল। অসহায় ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল বাকি সবাই। এক সময় ঘুরল কাফ্রি সরদার, হুইলহাউসে ঢুকে নিভিয়ে দিল স্পটলাইট।

সেলুনে রয়েছে রানা। একটা চেয়ারে বসে আছে, সামনে খালি একটা গ্লাস। বোতলটা ধরতে যাচ্ছে, এই সময় দরজা খুলে কেয়ার ফ্রি ক্লাবের মালিক জিমি মোরেল ভিতরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে উল্টোদিকের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'কেমন দেখলেন ওদিকটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওগুলো এখনও আছে?'

জবাব না দিয়ে দু'হাত তুলে মুখ ঢাকলেন মোরেল। 'প্লেনটা রিফ থেকে নেমে গেছে,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'নিন।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে মাথা নাড়লেন মোরেল। 'তার চেয়ে একটা সিগারেট ধরাই।' কাঁপা হাতে সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলেন।

খানিক পর মুখ খুলল রানা। 'আপনি তখন বললেন – আমার সুরাইয়া।'

'দিলরুবা আমাকে নিজের স্যুইটে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনাদের ব্যাপারটা সংক্ষেপে শোনালেন আমাকে। আপনি তাঁকে ভালবাসেন, তিনিও আপনাকে ভালবাসেন ইত্যাদি।'

'কোথায় যাচ্ছিল ও?' জানতে চাইল রানা। 'বৈরুতে?'

মাথা ঝাঁকালেন মোরেল। 'হ্যাঁ। হিযবুল্লাহ-র তরফ থেকে একটা অনুরোধ পেয়েছেন তিনি। ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশে গান গেয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ওই টাকা খরচ হবে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে আহত

হিযবুল্লাহদের চিকিৎসায়।'

'কিন্তু আমাকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছিল কেন?'

'দিলরুবার ধারণা, এভাবে বিদায় নেয়াটাই সবচেয়ে ভাল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এ আমি মেনে নিতে পারছি না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। কী সেটা?'

রানার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর মোরেল বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন, এর মধ্যে অন্য একটা কারণ আছে। তবে সেটা আপনাকে জানাতে নিষেধ করেছেন তিনি।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিলেন মোরেল। 'যেহেতু দিলরুবা বেঁচে নেই, কথাটা আপনাকে বলা যেতে পারে।' খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। 'তাঁর ব্লাড ক্যান্সার। আর মাত্র তিন মাস বাঁচতেন।'

টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। খিজির হায়াত ও কাফ্রি সরদারের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন মেনদেরেস। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল ও, রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারবে না রানা, একসময় খেয়াল করল অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে, পানির উপর থেকে সরে যাচ্ছে কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা।

দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটেছে। সাগরে এখন শান্ত ঢেউ, রিফের গোড়ায় আছাড় খেয়ে সামান্যই ফেনা তুলছে ওগুলো। ব্লো-হোল চুপ করে আছে। ফিরে গেছে হাঙরগুলো। সিপ্লেন ওয়ালরাসের ফিউযিলাযটাকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

পোর্ট সাইডের ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দূরে নোঙর ফেলেছে পুলিশ লঞ্চ। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে হাত নাড়ল সার্জেন্ট এনভার নেকমেতিন। তারপর পানিতে ফেলা ডিঙ্গিতে চড়ে বৈঠা চালাতে শুরু করল, ফরচুনার দিকে আসছে।

ইয়টের ডেকে উঠে এসে সার্জেন্ট বলল, 'সরকারী ডকে খবর পাঠিয়েছি আমি। ওরা একটা স্যালভেয বোট ও দুজন ডাইভার পাঠাচ্ছে। আশা করছি দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তার দরকার নেই। আমি নিজেই ডুব দেব।'

'পাগলামি করবেন না, হের রানা!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন মোরেল, হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর পিছু নিয়ে বাকি সবাইও আসছে। সন্দেহ নেই রানা ও সুরাইয়ার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা মোরেলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে তারা।

'আমাকে নামতেই হবে,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা।

কাফ্রি সরদার নরম সুরে বলল, 'ওখানে কিছু পাবেন না, সার, মিস্টার রানা। দু'একটা টাইগার শার্ক থাকতে পারে, কেউ কিছু ফেলে গেছে কি না দেখছে খুঁজে।'

'নিজের চোখে দেখতে হবে আমাকে,' বলে নেকমেতিনের দিকে ফিরল রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাফ্রি সরদারের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। 'আপনাদের এক্সট্রা অ্যাকুয়ালাঙটা দয়া করে রেডি করুন, সরদার। ওঁর সঙ্গে আমিও নামব।' রানার দিকে ফিরে ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটু হাসল সে। 'আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে এদিকের সব দায়িত্ব আমারই পালন করার কথা।'

'আপনারা দুজন সত্যি পাগল নাকি?' মেনদেরেস বললেন।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে জুতো ও জ্যাকেট খুলতে শুরু করল রানা। দেখাদেখি সার্জেন্ট নেকমেতিনও।

ঠাণ্ডা কম লাগবে ভেবে প্যান্ট ও শার্ট খুলল না ওরা। সেলুন থেকে ইকুইপমেন্ট নিয়ে এল কাফ্রি সরদার। হায়াতের সাহায্যে দ্রুত সেগুলো পরে নিল রানা ও নেকমেতিন।

রেইল টপকে ইয়টের কিনারায় দাঁড়াল দুজন, তারপর একসঙ্গে লাফ দিল। প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল ওদের ঠাণ্ডা

পানি। সারফেসের ঠিক নীচে ঝুলে রয়েছে রানা, এয়ার সাপ্লাই অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে স্বচ্ছ পানির গভীরে ডুব দিল, সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করল না।

রানার মনে হলো সময়টা যেন একটা ঘোরের কাটছে, যে-কোনও মুহূর্তে কেটে যাবে সেটা, আর তখন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে ও সুরাইয়াকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার ভিতর ঝুলে থাকতে দেখল রানা ওয়ালরাস প্লেনটাকে। রিফের গোড়া থেকে বিস্তৃত সামুদ্রিক ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে ওটা। সেদিকে এগোবার সময় সাগরের তলায় প্রবাহিত একটা স্রোতের আকর্ষণ অনুভব করল রানা, ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বিশাল একটা গহ্বরের দিকে। ওই অতল অন্ধকার গহ্বর থেকেই উঠে এসেছে রিফ, অর্থাৎ পাহাড়-প্রাচীরটা।

প্লেনের মূল কাঠামো এখনও অক্ষত রয়েছে, তবে লেজ ও ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট পুরোটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে গেছে কোথাও, ফিউজিলাজের একদিকে রেখে গেছে বিরাট একটা এবড়োখেবড়ো গর্ত। ছিন্নভিন্ন, তোবড়ানো ধাতব কাঠামো কালো হয়ে আছে। রানা ধারণা করল, প্লেনে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশে এসে স্থির হলো নেকমেতিন।

সামান্য ভাঁজ পড়ল সার্জেন্টের কপালে। আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর দুজন একসঙ্গে সাঁতরে প্লেনটার ভিতর ঢুকল। সিটগুলো আছে এখনও, কন্ট্রোল কেবিনের দরজাটা স্রোতের সঙ্গে মৃদু নড়ছে, তবে কোথাও কোনও লাশ নেই। ক্রু-আরোহীরা যেন স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কেবিনে ঢুকল নেকমেতিন। ফিউজিলাজ ধরে বাইরে থাকল রানা। সারফেসের উপরে সূর্য উঠছে, পানি ভেদ করে নেমে আসছে আলোর আভা। তবে প্রাণের কোনও উপস্থিতি চোখে পড়ছে না।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে রানার কাঁধে টোকা দিল সার্জেন্ট, তারপর হাত তুলে সামুদ্রিক ঘাসগুলো দেখাল – রিফের গোড়া থেকে শুরু, শেষ হয়েছে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় পৌঁছে, স্রোতের টানে শুয়ে আছে সব। সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল রানা, কী বোঝাতে চাইছে সে।

বছরের পর বছর জোরালো স্রোত বিরতিহীন আঘাত করে করে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়া খেয়ে ফেলেছে, নীচে তৈরি হয়েছে বিশাল একটা গুহা। হয়তো হাঙরগুলো আসবার আগেই স্রোতের টানে দু'একটা লাশ ওই গুহায় গিয়ে পড়েছে।

প্লেন ছেড়ে দিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়া লক্ষ্য করে এগোল রানা। গুহার মুখটা গাঢ় ও মোটা লম্বা একটা দাগ, মাত্র তিন ফুট চওড়া। মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে সার্জেন্টের জন্য অপেক্ষা করছে ও।

গুহার ভিতর ছোট ছোট রঙ-বেরঙের মাছের কোনও অভাব নেই, বেশিরভাগই গায়ে রঙধনু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর মাথার উপর ক্যাথেড্রাল-এর খিলান তৈরি করেছে ওগুলোর একটা বিরাট ঝাঁক, ছাদের ব্লো-হোল হয়ে নীচে নামছে দিনের প্রথম রোদ।

আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ, যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও রয়েছে রানা। হঠাৎ ওর পাশে চলে এল সার্জেন্ট, অমনি মাছের বিশাল মেঘটা ভেঙে গেল, দেখা গেল গুহার ছাদে একটা লাশ আটকে রয়েছে, নীচের দিকে মুখ করা।

রাহি সামদানির লাশ। বাতাস ভর্তি একটা লাইফ-জ্যাকেট পরে থাকায় ছাদের সঙ্গে সেঁটে আছে দেহটা। চোখ দুটো বন্ধ, হাত-পা স্থির। শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। নেকমেতিন ও রানা একসঙ্গে উঠছে, ওদের পথ থেকে ছুটে পালাচ্ছে মাছগুলো। সাঁতরে গুহার মুখের দিকে ফিরে আসছে ওরা দুজন।

বিশ ফুটে ডিকমপ্রেশন-এর জন্য কয়েক মিনিট থামল ওরা,

সারফেসে মাথা তুলল ফরচুনার পিছন দিকে। সবার আগে খিজির হায়াতই দেখতে পেল ওদেরকে। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেও, ওদের বোঝাটাকে চিনতে পেরে অকস্মাৎ বুজে এল তার গলা।

ইয়টের পাশে একটা মই নামিয়ে রেখেছে কাফ্রি সরদার, সেটা বেয়ে দ্রুত নেমে এল সে, হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরে ফেলল মৃত পাইলটের লাইফ-জ্যাকেট। তাকে সাহায্য করবার জন্য মইয়ের মাথা থেকে নীচের দিকে ঝুঁকলেন আদনান মেনদেরেস। সবার শেষে রানা যখন মইয়ের মাথায় উঠে এল, রাহি সামদানির লাশটা ততক্ষণে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে হুইলহাউসের পাশে।

'গায়ে কোনও দাগ নেই,' অবাক হয়ে বলল খিজির হায়াত। 'ওগুলো ওকে ধরেনি কেন?'

মাস্কটা মাথার দিকে ঠেলে দিল রানা, মুখ থেকে বের করল রাবার মাউথপিস। 'ওকে আমরা রিফের তলা থেকে পেয়েছি। প্লেন পানিতে পড়ার সময় সম্ভবত কন্ট্রোলে ছিল ও। কেবিন থেকে বেরুতেই জোরাল একটা স্রোত সোজা গুহার ভেতর টেনে নেয়।'

'তা হলে ওর লাইফ-জ্যাকেট ফোলা কেন?'

'সম্ভবত তলিয়ে যাবার সময় রিফ্লেক্স অ্যাকশনে বাতাস ভরে নিয়েছে। হয়তো বুঝতে পেরেছিল কী ঘটতে যাচ্ছে, ভেবেছিল ব্লো-হোল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে।'

মেনদেরেস জিজ্ঞেস করলেন, 'বাকি সবাই?'

'ওখানে আর কিছুই নেই,' জবাব দিল সার্জেন্ট নেকমেতিন। 'আমার মনে হলো প্লেনে কিছু একটার বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

ভ্রূ কোঁচকালেন মেনদেরেস। 'কিছু বলতে কী? দুই ইঞ্জিনের একটা?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। 'যাই ফেটে থাকুক, জিনিসটা ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টে ছিল। লেজের পুরোটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

হঠাৎ নীরবতা নেমে এল। হায়াত শুধু একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল, তা ছাড়া অনেকক্ষণ আর কোনও শব্দ নেই। তারপর, ধীরে ধীরে জানতে চাইলেন মোরেল, 'আপনি বলতে চাইছেন, সার্জেন্ট, ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়?'

নিজের অ্যাকুয়ালাঙ ডেকে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর হায়াতের হাত থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে রাহি সামদানির মুখটা ঢেকে দিল। সিধে হলো, আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে ওকে, সরাসরি নেকমেতিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'না,' সার্জেন্ট জবাব দিল। 'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, কোনও সন্দেহ নেই, স্যাবোটাজ।'

## ছয়

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে সোজা বেডরুমে ঢুকল রানা। যেমন রেখে গেছে বিছানা – ধস্তাধস্তির ফলে এলোমেলো – এখনও তেমনি আছে। বালিশের একটা অংশ এখনও নিচু হয়ে আছে, যেখানে মাথা রেখেছিল সে। ঝুঁকে সেখানটায় হাত বুলাল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন শাওয়ার সেরে নতুন কাপড় পরছে রানা, নক করে ভিতরে ঢুকল তরুণ সার্জেন্ট নেকমেতিন। ড্রইং রুমের সিঙ্গেল সোফায় বসে একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'রাহি এয়ার অ্যান্ড সি ট্রাভেল থেকে সিপ্লেন ওয়ালরাস ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্টটা নিয়ে এসেছি। মাত্র চারজন। দিলরুবা ওরফে

সুরাইয়া, ফ্রাজিয়ো নামে এক ব্রাযিলিয়ান ব্যবসায়ী, মিসেস সিমসন নামে এক ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট ও সেলিম মোস্তাকিম।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'সেলিম মোস্তাকিম? তুর্কি সাইপ্রিয়ট?' তীক্ষ্ণ হলো চোখের দৃষ্টি।

সার্জেন্ট বলল, 'না, ফিলিস্তিনি।' তাঁর সম্পর্কে যা জানে বলে গেল সে।

মধ্যবয়স্ক, একটু খোঁড়াতেন। সেলিম মোস্তাকিম নয়, তাঁর আসল নাম ডক্টর মোসাদ্দেক মাসলান। প্যালেস্টাইনের রামাল্লায় মোসাদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন এই বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী। ছাড়া পাওয়ার পর থেকে খোঁড়াতেন।

বৈরুতে পালিয়ে এসে হিযবুল্লাহকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডক্টর মোসেদ্দেক মাসলান, বিশেষ করে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের সময়। তখনই ইজরায়েলিদের বোমা হামলায় আহত হন। চিকিৎসা নিতে তুর্কি সাইপ্রাসে চলে আসতে হয় তাঁকে। এখানে এসে একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি যে লেবাননে ফিরে যাচ্ছেন, তা সে জানত না।

'প্রতিপক্ষরা ঠিকই জানত,' বিড়বিড় করল রানা। 'তবে ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টে বোমাটা তারা রাখল কীভাবে?'

'খুব সহজে,' বলল নেকমেতিন। 'হ্যাঙ্গারে বা রানওয়েতে তেমন লোকজন থাকে না, সন্ধের পর প্লেনের কাছে পৌঁছানো কারও জন্যে কোনও সমস্যা নয়।'

'এখন কী করবেন আপনারা?'

'কমিশনার-এর সঙ্গে গ্রিক সাইপ্রাসে যাচ্ছি আমি – লারনাকা বে-র ধেকেলিয়া-য়,' বলল নেকমেতিন। 'ওখানে ইউ.এন. আর্মড পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিটিং আছে। আশা করছি সন্ধের আগেই ফিরতে পারব। কিছু জানতে পারলে বলব আপনাকে। মেয়েটির কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার রানা। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

সার্জেন্ট চলে যাওয়ার দশ মিনিট পর স্যুইট থেকে বেরিয়ে বার-এ চলে এল রানা।

কেউ নেই বারে। তবে টেরেসে পাওয়া গেল জিমি মোরেলকে, বেলা করে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। 'আসুন, হের রানা। ব্রেকফাস্ট খান।'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু কফি।'

কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। ধীরে ধীরে কাপটা খালি করল রানা। মোরেলের বয়স হলে কী হবে, স্বাস্থ্য খুব ভাল, খিদেও প্রচুর। সময় নিয়ে খাচ্ছেন তিনি।

'আদনান মেনদেরেসকে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সার্জেন্ট নেকমেতিন মনে হয় গ্রিক সাইপ্রাসে গেলেন, হের মেনদেরেসকেও তাঁর সঙ্গে যেতে দেখলাম।'

রানার জানা আছে, দুই সাইপ্রাসে আসা-যাওয়া করতে পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না।

'ডক্টর মোসাদ্দেক মাসলান সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছেন সার্জেন্ট নেকমেতিন?'

সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল জিমি মোরেলের। মাথা ঝাঁকালেন। 'ইজরায়েলিদের এই অন্যায় আচরণ কোনওমতে মেনে নেয়া যায় না।'

'বোমাটা কখন কীভাবে রাখা হয় প্লেনে, তার একটা ধারণা দিয়েছেন সার্জেন্ট,' প্রসঙ্গ বদলে বলল রানা। 'সেটা ভুল।'

'কী রকম?' কৌতূহলী দেখাল মোরেলকে। 'আমার তো সেটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়েছে।'

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল রানা। 'পরে শুনলাম রাহি সামদানি সব সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লোডিং-এর কাজটা করত। বছর কয়েক আগে এক শিপিং ক্লার্ক তার প্লেনে দুই কিলো হেরোইন তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, সেই থেকে কোনও রকম ঝুঁকি নিত না সে। তা ছাড়া, লাগেজ

কমপার্টমেন্টে সব সময় তালা দিয়ে রাখতে দেখা গেছে তাকে। দরজায় কিছু করা হলে নিশ্চয়ই সেটা তার চোখে পড়ত।'

'সেক্ষেত্রে বোমাটা কারও লাগেজে করে তোলা হয় প্লেনে,' চোখে-মুখে উদ্বেগ নিয়ে বললেন মোরেল। 'হয়তো ডক্টর মোসাদ্দেক মাসলানের লাগেজেই ছিল ওটা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অসম্ভব নয়। যার লাগেজেই থেকে থাকুক, বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানত না সে। কাজটা হয়তো হোটেল বা ক্লিনিকে করা হয়েছে। তবে ডক্টর মাসলান এতটা অসতর্ক হবেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না।'

'যার লাগেজেই বোমাটা থাকুক, কালপ্রিটকে খুঁজে বের করা সম্ভব,' বললেন মোরেল। 'আরোহীরা কে কোথায় ছিল জানতে পারলে সেখানকার ওয়েটার, গার্ড ও ম্যানেজারকে জেরা করলে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।'

'গুড আইডিয়া,' বলল রানা। 'তালিকার কেউ আপনার হোটেলে ছিল?'

মাথা নাড়লেন মোরেল। 'ডক্টর মাসলান ছিলেন আতাতুর্ক ক্লিনিকে। আপনি চাইলে ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করতে পারি আমরা।'

জার্মান ভদ্রলোক সাহায্য করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, সেজন্য মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। 'ধন্যবাদ,' বলে চেয়ার ছাড়ল ও। 'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি একা আতাতুর্ক ক্লিনিকে যান। আমি যাই দেখি আরেকটা প্যাসেঞ্জার লিস্ট যোগাড় করা যায় কি না। তা হলে জানতে পারব বাকি দুজন কোথায় উঠেছিল।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকালেন মোরেল। 'সরাইখানায় দেখা হবে। তবে পুলিশকে জানানো দরকার না?'

'সার্জেন্টের ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে, ততক্ষণে আমাদের পাখি উড়ে যেতে পারে।'

ট্যাক্সি নিয়ে জেটির কাছে চলে এল রানা। নিচু পাঁচিলে বসে দুজন নাবিকের সঙ্গে গল্প করছে চর্বি ও মাংসের ডিপো কাফ্রি সরদার সালেভান। রানাকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, ধুলো ভর্তি পথে নেমে আসছে। 'আজ আমরা বেরুব, মিস্টার রানা?'

কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল রানা। ওর পিছু নিয়ে কয়েক পা হাঁটল সরদার, তারপর পিছিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে – রানাকে দেখতে দিতে চায় না তার চোখ দুটো অকারণে ভিজে উঠেছে।

এয়ারপোর্টে এসে রাহি এয়ার অ্যান্ড সি ট্রাভেল-এর অফিসে ঢুকল রানা। একজন ক্লার্ককে নিজের আইডি কার্ডটা দেখিয়ে বলল, 'কাল রাতে সিপ্লেন ওয়ালরাস অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, জানেন তো? কেসটা তদন্ত করছি আমরা।'

কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখল ক্লার্ক। তারপর বলল, 'কিন্তু, সার, রানা এজেন্সির কি এ-ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করার পারমিশন আছে?'

'মেইনল্যান্ডে আছে,' বলল রানা। 'আপনি চাইলে আঙ্কারা-র পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন এখানেও আছে কি না।'

'ঠিক আছে, সার।' ঝামেলা না বাড়িয়ে সহযোগিতা করবার সিদ্ধান্ত নিল তুর্কি ক্লার্ক। 'কী করতে হবে বলুন।'

'সার্জেন্ট নেকমেতিনকে একটা প্যাসেঞ্জার লিস্ট দিয়েছেন আপনারা,' বলল রানা। 'ওটার একটা কপি দরকার আমার।'

'আমি না, আমার কলিগ দিয়েছে।' ফাইলিং কেবিনেটের দেরাজ খুলে একটা কমপিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল তরুণ ক্লার্ক। 'নিন, সার, এটাই আমাদের ফাইনাল কপি। সার্জেন্ট চলে যাবার পর তৈরি করা হয়েছে।'

'ফাইনাল কপি?' বলল রানা। 'মানে?'

'মানে হলো, প্রায়ই দেখা যায় ফ্লাইট মিস করল কেউ – হয় সময় মত পৌঁছাতে পারল না, নয়তো অন্য কোনও কারণে যাবে

না,' ব্যাখ্যা করল ক্লার্ক। 'এরকম হলে ফাইনাল কপিতে তাদেরকে আমরা রাখি না।'

নিজের ভিতর ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি হলো রানার। মাত্র এক ঝলক আলোয় সব অন্ধকার যেন কেটে যাচ্ছে। কাউন্টারের দিকে ঝুঁকল ও, সাবধানে বলল, 'কাল রাতের ওয়ালরাস ফ্লাইট মিস করেছে কেউ?'

মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'আহমেদ রব্বানি নামে এক ভদ্রলোক। তার সিট বুক করি আমি দুপুরের দিকে, কিন্তু ফ্লাইট ধরতে আসেননি তিনি।'

'তার লাগেজ?' জানতে চাইল রানা।

'ওগুলো আগেই প্লেনে তোলা হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোককে আমি জানাই, সাতটার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে সব। মিস্টার সামদানি চাইতেন, লাগেজ আগেভাগে তুলতে হবে।'

'এই ব্যাপারটা আপনি সার্জেন্টকে জানিয়েছেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'ঘুমাচ্ছিলাম, তাই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি,' বলল ক্লার্ক। 'দুর্ঘটনার কথা মাত্র আধ ঘণ্টা আগে শুনেছি আমি।'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, দেখল ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কাফ্রি সরদার। দুজন নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ট্রাভেল অফিস থেকে।

'এর মানে বুঝতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সরদার। 'এতক্ষণে বোধহয় দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে ও, মিস্টার রানা।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তবু একবার খোঁজ নেয়া দরকার।'

'নিন,' তাগাদা দিল রানা। 'তাড়াতাড়ি হারবারে চলে যান। খবর নেবেন কাল রাতে কোনও বোট ছেড়েছে কি না, বিশেষ করে বৈরুত কিংবা গ্রিক সাইপ্রাসের উদ্দেশে। আমি হের মোরেলের কাছে যাচ্ছি। ইয়টে দেখা হবে।'

সৈকতে বেরিয়ে এসে হনহন করে হারবারের দিকে এগোল সরদার। রানা যাচ্ছে আতাতুর্ক ক্লিনিকের দিকে, জেটি থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে ওটা।

ক্লিনিকের ভিতর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন জিমি মোরেল। কমপ্লিট সুট পরে থাকায় ঘামছেন তিনি। চোখ-মুখ থমথম করছে। 'ক্লিনিকের মালিক বললেন তাঁর স্টাফ সবাই পুরানো ও বিশ্বস্ত,' রিপোর্ট করবার সুরে রানাকে বললেন তিনি। 'দ্বীপেরই লোক তারা সবাই। আপনি কিছু জানতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সংক্ষেপে ফাইনাল লিস্ট ও আহমেদ রব্বানি সম্পর্কে জানাল। সবশেষে বলল, 'ফ্লাইটের সময় আসেনি সে, তবে তার লাগেজ আগেই প্লেনে তোলা হয়ে গিয়েছিল।'

'ওহ্, গড!' চোখদুটো বড় হয়ে উঠল জার্মান ভদ্রলোকের। 'তাকে... নাহ্, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়েছে!'

'সরদারকে হারবারে পাঠিয়েছি, দেখা যাক কী খবর আনে।'

এই সময় হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল। ঘাড় ফেরাতেই কাফ্রি সরদারকে দেখতে পেল ওরা, কালো মেঘের মত এদিকেই ছুটে আসছে। দরদর করে ঘামছে সে, চওড়া বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

'আপনার কথাই ঠিক, মিস্টার রানা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সরদার। 'ওই যে জাত মাতালটা, বিউ পাপোস! সে তার বোটে করে এক লোককে গ্রিক সাইপ্রাসের ধেকেলিয়ায় নিয়ে গেছে। শুনে মনে হলো, একেই বোধহয় খুঁজছি আমরা।'

'কী শুনে মনে হলো?' জানতে চাইল রানা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে ব্যাখ্যা করল কাফ্রি সরদার। বোটটা ভাড়া করা হয়েছিল দুদিন আগে। কথা মত কাল সন্ধে ঠিক সাতটায় মারহাবা কফি হাউসে বিউ পাপোসের সঙ্গে দেখা করতে আসে লোকটা। আবহাওয়া খারাপ বলে পাপোস প্রথমে বোট

ছাড়তে রাজি হয়নি। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক বেধে যায়। মারহাবা-র মালিক সরদারকে জানিয়েছে, লোকটা পাঁচশো তুর্কি পাউন্ড ঘুষ দিয়ে রাজি করায় পাপোসকে।

'আচ্ছা। যান, নোঙর তুলে তৈরি হোন, আমরা ধেকেলিয়ায় যাচ্ছি।' ওর কথা শেষ হতে যা দেরি, রওনা হয়ে গেল সরদার।

'আমার তা হলে করার মত কিছু নেই?' বেজার মুখে জানতে চাইলেন মোরেল।

'এমনও হতে পারে যে আমরা হয়তো মরীচিকার পেছনে ছুটছি,' বলল রানা। 'কাজেই বন্দরের বাকি দুটো সরাইখানাতেও খোঁজ নেয়া দরকার, হের মোরেল।'

মাথা ঝাঁকালেন মোরেল। 'ঠিক আছে, নিচ্ছি খোঁজ।'

জেটির দিকে এগোল রানা। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ফরচুনা।

দুপুর একটায় গ্রিক সাইপ্রাসের লারনাকা বে-তে পৌঁছাল ওরা। বে-র কিনারায় রীতিমত বাজার বসে গেছে। অসংখ্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা করে পণ্য নিয়ে এসেছে সওদাগররা।

হারবারের উল্টোদিকে একটা পুরানো জেটিতে ইয়টের রশি বাঁধল কাফ্রি সরদার। আধ ঘণ্টা সৈকত ধরে হাঁটাহাঁটির পর বিউ পাপোসের বোটটা দেখতে পেল ওরা। ডেকে উঠে কেবিনে উঁকি দিল রানা। খালি।

জেটিতে ফিরে এসে রানা দেখল, পাঁচিলে বসে বড়শিতে মাছ ধরছে দুজন জেলে। সরদারের প্রশ্নের জবাবে তাদের একজনকে বলতে শুনল, কাল রাতে শহরে মাতলামো করতে দেখা গেছে পাপোসকে।

রানার দিকে তাকাল কাফ্রি সরদার। 'মিস্টার রানা, শহরের বারগুলোয় খোঁজ নিতে হবে।'

'রাস্তা তো বেশ কয়েকটা,' বলল রানা। 'আপনি ডানদিক

কাভার করুন, আমি বাম দিক। দু'ঘণ্টা পর বোটে দেখা হবে।'

গ্রিক সাইপ্রাসে মদ বেচতে লাইসেন্স লাগে না, ফলে ব্যাঙের ছাতার মত বার গজিয়েছে। বিকেল চারটের কিছু পরে ব্যর্থ হয়ে হারবারে ফিরে এল রানা। কাল রাতে শহরের প্রায় সবগুলো বারে ঢু মেরেছে পাপোস, তবে কেউ বলতে পারছে না এই মুহূর্তে কোথায় আছে সে। দেখা যাক সরদার কিছু জানতে পেরেছে কি না।

জেটির দিকে ফিরছে রানা, হঠাৎ দেখল ওর দিকে হেঁটে আসছেন আদনান মেনদেরেস, হাসিমুখে বললেন. 'আরে, আপনি এখানে?'

'ছোট্ট একটা কাজে,' বলল রানা। 'আপনি?'

'এখানে এসেছি সার্জেন্ট নেকমেতিনের লিফট নিয়ে,' বললেন মেনদেরেস। 'শহরটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।' রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছলেন। 'নাইট লাইফ নাকি সত্যি ইন্টারেস্টিং। ফার্স্ট রেট ক্যাসিনো। গলা ভেজাবেন, মিস্টার রানা?'

লোকজনের ভিড়ে কাফ্রি সরদারকে দেখতে পাচ্ছে রানা। 'ধন্যবাদ, এখন না,' বলল ও। 'একটু ব্যস্ত আছি।' সিরিয়ান এজেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরদারের দিকে এগোল ও।

'খবর ভাল,' বলল সরদার সালেভান। 'একটা হোটেলে উঠেছে পাপোস, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মেনদেরেস সাহেব এখানে কী করছেন?'

কী কাজে ব্যস্ত সিরিয়ান এজেন্ট, ভাল করেই জানে রানা। বলল, 'বেড়াচ্ছেন।'

হোটেলটায় পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট লাগল ওদের। রুম নম্বর জেনে নিয়ে নক করল রানা। কোনও সাড়া নেই। পরবর্তী দশ মিনিট শুধু দরজা ভেঙে ফেলতে বাকি রাখল ওরা, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হলো না। অগত্যা খবর দেওয়া হলো ম্যানেজারকে।

স্পেয়ার চাবি দিয়ে দরজা খুলল ম্যানেজার। ওদের আশঙ্কা মিথ্যে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা যায়নি পাপোস, কিংবা আততায়ীর হাতে খুনও হয়নি সে। চোখে-মুখে কয়েক ঝাপটা পানি ছিটাতেই জ্ঞান ফিরে এল।

ওদের জেরার উত্তরে থেমে থেমে জড়ানো গলায় পাপোস জানাল, মাথায় সাদা মাঙ্কি ক্যাপ পরে জেটির কাছে সারাক্ষণ বসে থাকে একটা কিশোর ছেলে, বোট থেকে নেমে তার সঙ্গে চলে গেছে আহমেদ রব্বানি। কোথায়, তা সে জানে না।

হারবারে পাওয়া গেল ছেলেটাকে, পাপোসের বোটের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে পানিতে ছিপ ফেলে বসে আছে, পায়ের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা কালো কুকুর। ছেলেটার বয়স হবে বড়জোর বারো, গায়ে হলুদ ফুটবল জার্সি।

মুক্তোর মত ঝলমলে হাসি উপহার দিয়ে সরদার তাকে বলল, 'কিছু পাওয়া যাচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'বললে বিশ্বাস করবেন না, সার, সবকটা পেছন ফিরে আছে। আজ আমার লাকি দিন নয়।'

'তা না-ও হতে পারে,' ভাঙা ভাঙা গ্রিক ভাষায় কথাটা বলে এক সাইপ্রাস-পাউন্ডের একটা নোট বের করে ভাঁজ করল রানা, দু'আঙুলের মাঝখানে গুঁজে রেখে ছেলেটার দিকে তাকাল।

চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল ছেলেটার। 'কী চান আপনি, মিস্টার?'

'স্যালামেস বন্দরের বিউ পাপোসকে চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওইত্তো তার বোট।'

'কাল রাতে এক লোককে ধেকেলিয়ায় নিয়ে এসেছে পাপোস,' বলল রানা। 'তুমি সেই লোকের ব্যাগ বয়ে নিয়ে গেছ। আমরা জানতে চাই কোথায় গেছে সে।'

'বললে ওই টাকা আমার?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটা, উত্তরে

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আরে, এ তো একদম পানি।' দূরে বসে থাকা আরেক ছেলেকে ডেকে তার হাতে ছিপ ধরিয়ে দিল সে, তারপর সিধে হয়ে জুতোর ডগা দিয়ে কুকুরটার পেটে মৃদু খোঁচা মারল। 'আসুন, মিস্টার, ওর অর্ধেক দিলেও চলবে,' বলে বে স্ট্রিটে উঠে এসে হাঁটা ধরল।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে এত দ্রুত হাঁটছে ছেলেটা, তার পিছু নিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। গলি-উপগলি হয়ে ছোট একটা চৌরাস্তায় এসে থামল সে।

চারদিকে পাথর দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর, উপরে ঢেউ টিনের ছাদ। হাত তুলে পঞ্চাশ গজ দূরের একটা একতলা বাড়ি দেখাল ছেলেটা। 'ওই বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকেছে লোকটা। আমাকে পয়সা দিয়েছে পেছনের উঠানে দাঁড়িয়ে। আমি চলে যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছি এক মহিলা দরজা খুলে দিয়ে তাকে বলল, "ও, রব্বানি!"'

তার হাতে পাউন্ডটা গুঁজে দিল রানা। বলল, 'পুরোটাই নাও।'

'থ্যাঙ্কিউ, সার!' স্যালিউট করল রানাকে, তারপর 'চল, টমি!' বলেই ছুটল ছেলেটা।

'এখানেই থাকুন আপনি,' সরদারকে বলল রানা। 'দশ মিনিট পর যদি না ফিরি, খোঁজ নেবেন।'

'মিস্টার রানা,' কাফ্রি সরদার বলল, 'নিজেরা কিছু না করে এবার আমাদের পুলিশের সাহায্য নেয়া উচিত। কী বলেন?'

'অত সময় নেই,' বলে বাড়িটার পাশের গলিতে ঢুকে ভাঙা গেট দিয়ে পিছনের উঠানে চলে এল রানা। চারদিকে আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। একটা বারান্দায় উঠে দরজায় নক করল ও।

কামরার ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজার কবাট মাত্র এক ইঞ্চি খুলল। একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কে? কাকে চাই?'

'রব্বানিকে খুঁজছি,' বলল রানা। 'খুব দরকার।'

'ভেতরে এসো।' চেইন সরানোর আওয়াজ হলো। কবাট খুলে দিয়ে করিডর ধরে হাঁটা ধরল মেয়েটি। এক পলক দেখে বেশ সুন্দরীই মনে হলো রানার।

চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। পিঁয়াজ, এলাচ, সেদ্ধ গরুর মাংস ও পেশাবের গন্ধ ঢুকল নাকে।

একটা দরজা খুলল মেয়েটি, তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তার পিছু নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল রানা। বেশ পরিষ্কার কামরা। মেঝেতে ছোট একটা কার্পেট ও পুরানো একসেট সোফা। সরাসরি রানাকে দেখছে মেয়েটি, আচরণে কোনও রকম জড়তা নেই। বয়স হবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ।

'আমি তিরানা, রব্বানির গার্লফ্রেন্ড।' অকারণে হেসে উঠে বলল সে, হাত তুলে একটা সোফা দেখিয়ে দিল। 'বসো ওখানে। আমাকে তোমার দরকার?'

তার বলার সুরে ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট। মাথা নেড়ে রানা বলল, 'ঠিক তা নয়।'

'তার মানে কোনও কাজে এসেছ।'

'হ্যাঁ।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল তিরানা। 'দেখতে তো নায়ক। কে তুমি?' চোখে পলক পড়ছে না তার।

'রব্বানির বন্ধু, বিদেশি, কয়েক বছর আগে চিনতাম তাকে।'

'বুঝলাম, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে,' বলে বিছানার কিনারায় বসল তিরানা। 'এক প্যাকেট সিগারেট রাখো এখানে, তারপর বলো কী ব্যাপার।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'রব্বানি কোথায় যেন গেছে বললে?'

সিগারেট ধরিয়ে সিলিঙের দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল তিরানা। 'বলিনি। হপ্তা দুয়েক ধেকেলিয়ায় ছিল না সে। হঠাৎ

কাল রাতে ফিরে এসেছে।'

'আজ সকালে ঠিক কটায় বেরিয়েছে?'

'এই দশটার দিকে।' শ্রাগ করল মেয়েটি। 'মাংস কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি নেই, একটা কাগজে লিখে রেখে গেছে সন্ধ্যায় ফিরবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা বোধহয় হবার নয়।'

ভ্রূ কোঁচকাল তিরানা। 'কী বলতে চাও তুমি, মিস্টার?'

'মনে হচ্ছে, তোমাকে ফেলে পালিয়েছে,' বলল রানা।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল তিরানা, রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'তুমি প্রলাপ বকছ!'

'কোথায় গেছে সে?'

'আমাকে বলে যায়নি।'

'তবু একটা ধারণা তো থাকবে, কোথায় যেতে পারে?'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবার ভাল করে দেখল মেয়েটি। তারপর বেশ সময় নিয়ে মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল, দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে তার শরীরের বিশেষ জায়গাগুলো কেমন সুগঠিত, দেহের বাঁধন কী সুন্দর। 'আফটার অল তুমি আমার মেহমান – কফি না জিন?'

ইতস্তত করছে রানা।

'আমাকে এতই যদি অসহ্য লাগে, দূর হও এখান থেকে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি।

'ঠিক আছে, কফি।'

ফিক করে হেসে ফেলল গ্রিক ললনা। 'এমনি মেজাজ দেখাচ্ছিলাম। অপেক্ষা করো, হ্যাঁ?' দমকা বাতাসের মত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

বিপদের আশঙ্কা করছে রানা। হোলস্টারটা ক্লিপ দিয়ে প্যান্টের ভিতর দিকে আটকানো, তলপেটের কাছে। পিস্তলের বাঁটটা আলতো করে স্পর্শ করল একবার।

একটু পরই বড় একটা কাপে করে ধূমায়িত কফি নিয়ে এল তিরানা। নিজের জন্য একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি এনেছে। 'প্রায় মাসখানেক হলো কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে রব্বানি।' বিছানার কিনারায় বসে গ্লাসে চুমুক দিল সে। 'প্রথমে আভাসে বলতে চাইল, বড় একটা দাঁও মারার সুযোগ পেয়েছে, ব্যাপারটা ক্লিক করলে সারাজীবন আর খেটে খেতে হবে না। কিন্তু কাজটা কী তা আমাকে বলবে না। তারপর বলল, না বুঝে খুব খারাপ লোকদের পাল্লায় পড়ে গেছে সে। তাদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারবে কি না জানে না।'

'জানতে চেষ্টা করোনি খারাপ লোকগুলো কারা?'

গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল তিরানা। 'দুইদিন আমি তার পিছু নিই। দুবারই একটা বিশেষ বাড়িতে গেছে সে।'

'কার বাড়িতে?'

'আমাকে যখন তোমার দরকার নেই,' বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকাল তিরানা, 'কিছু না পেয়ে কেন তোমার প্রশ্নের জবাব দেব আমি?'

রানার হাতে মানিব্যাগ বেরিয়ে এল, বিছানার উপর সাইপ্রাস পাউন্ডের কয়েকটা নোট রাখল ও।

নোটগুলো ছোঁ দিয়ে তুলে নিল তিরানা, তারপর অভ্যস্ত হাতে দ্রুত ব্লাউজের ভিতর গুঁজে রাখল। 'মহিলা গণক। নাম ম্যাডাম লেফকারা। হারবারের কাছে, গ্র্যান্ট স্ট্রিটে থাকে। রব্বানিকে আমি তার বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি দুদিন।'

'কেন গেল? কোনও ধারণা করতে পার?'

'আমি জিজ্ঞেস করতে যাই, আর ও আমার কান কেটে নিক!'

কফির কাপ নামিয়ে রাখল রানা, 'ধন্যবাদ।' সোফা ছাড়ল।

বালিশে হেলান দিয়ে বুকদুটো আরও একটু উঁচু করল তিরানা, রানার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। 'এত তাড়া কীসের? রব্বানির ফিরতে তো এখনও দু'ঘণ্টা বাকি।'

দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

বাইরে ইতিমধ্যে সন্ধে নেমেছে। চৌরাস্তায় ফিরে এল রানা। একটা দোরগোড়ার আড়াল থেকে উদয় হলো কাফ্রি সরদার। 'কী খবর, মিস্টার রানা?'

'ভাল। ম্যাডাম লেফকারা নামে কোনও গণককে চেনেন?'

সরদারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'কে না চেনে তাকে। এর সঙ্গে জড়িত নাকি লোকটা?'

'হয়তো। তার বাড়িটা আপনি চেনেন?'

'তীর থেকে বেশি দূরে নয়,' খানিক ইতস্তত করে বলল সরদার। 'মিস্টার রানা, ম্যাডাম লেফকারার কিন্তু অনেক দুর্নাম। সে নাকি অপবিত্র, অশুভ একটা চরিত্র। কেউ তাকে ভাল বলে না। সবাই ভয় পায়।'

'আপনার ভয় হচ্ছে মন্ত্র পড়ে আমাকে সে বশ করে ফেলবে?'

ঘামতে শুরু করেছে কাফ্রি সরদার। হঠাৎ তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক সাদা দেখাচ্ছে। 'লোকে বলে শিস বাজিয়ে ভূত ডেকে আনতে পারে সে। এ-ও শোনা যায় যে সাগরে ডোবা মানুষকে জাদুবলে তুলে আনতে পারে।'

রানার গা ছমছম করে উঠল – ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে বলে, নাকি সরদারের কথা শুনে, ঠিক বলতে পারবে না। তবে জোর করে একটু হাসল ও, বলল, 'চলুন, সত্যি কি না দেখে আসি।'

# সাত

বাড়িটা ছয় ফুট উঁচু সাদা চুনকাম করা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটটা খুলল রানা, ইঁট বিছানা সরু পথ ধরে হেঁটে এসে এক প্রস্থ কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় থামল। 'আশপাশে কোথাও গা ঢাকা দিন আপনি,' কাফ্রি সরদারকে বলল ও। 'যদি শোনেন গোলমাল হচ্ছে, লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলবেন।'

অন্ধকার উঠানে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল সরদার। ধাপগুলো টপকে বারান্দায় উঠে এসে দরজায় নক করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। জানালার ঝাপসা কাঁচে একটা সচল মূর্তিকে পলকের জন্য দেখতে পেল রানা। দরজা খুলে গেল, বৃদ্ধা এক মহিলা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ম্যাডাম লেফকারা?'

'কী চাও তুমি?' বৃদ্ধার গলার আওয়াজে এতটুকু প্রাণ নেই।

'আপনি যদি আমাকে দু'মিনিট সময় দিতেন,' নরম সুরে বলল রানা।

'গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। বোধহয় আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধা। 'তা হলে ভেতরে এসো।'

করিডরটা প্রায় অন্ধকার, চারদিক থেকে ধুপ আর লোবানের গন্ধ ভেসে আসছে। ভেলভেটের ভারী পরদা সরিয়ে একটা দরজা খুলল বৃদ্ধা।

কামরাটা বেশ বড়, সাজানোও হয়েছে সুন্দর সব ফার্নিচার দিয়ে। টেবিলে শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে। ওটার সামনে একটা চেয়ারে বসল রানা। বৃদ্ধা বসল টেবিলের ওপাশে, হাতের বাম দিকে প্যাড ও কলম রয়েছে, ডানে রয়েছে কয়েকটা বই।

'জন্ম তারিখ, জন্মস্থান ও দিনক্ষণ বলো। সময়টা সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ।'

জবাব দিল রানা। বৃদ্ধার কাঁধের উপর দিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেছে কামরার অন্ধকার অংশে। মনে হচ্ছে, কোণগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে কিম্ভূতকিমাকার সব ছায়া। কল্পনার লাগাম টেনে ধরে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করল রানা।

কয়েকটা বই ঘাঁটল বৃদ্ধা, প্যাডে কিছু লিখল, সবশেষে মাথা ঝাঁকাল। 'সুপারন্যাচারালে বিশ্বাস আছে তোমার?'

'বিশ্বাস না থাকলে এখানে আসি?'

'তুমি কি অ্যামবিডেক্সট্রাস, মানে, সব্যসাচী?' বৃদ্ধা জানতে চাইছে, রানা ডান ও বাম হাত একই রকম দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে কি না।

মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল রানা। 'আপনি জানলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমার রাশির অনেকের বেলায় কথাটা সত্যি।' নোটগুলোর উপর আরেকবার চোখ বুলাল বৃদ্ধা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'জীবনটা তোমার জন্যে প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে।'

'উম্‌ম্‌, তা বলতে পারেন।'

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যাডাম লেফকারা। 'মাঝ আকাশে মঙ্গল, সূর্য ও নেপচুনের মিলন ঘটলে বাকশক্তি ও মেজাজ হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ। প্রায়ই দেখা যায় তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।'

হেসে উঠল রানা।

ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধা। 'আমার কথার মধ্যে হাসির কিছু পেয়েছ তুমি?'

'পেলাম বইকি।'

বইগুলো গুছিয়ে রাখছে ম্যাডাম লেফকারা। 'কে তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে?'

'আহমেদ রব্বানি,' বলল রানা।

চোখ তুলে তাকাল বৃদ্ধা, পলক পড়ছে না। 'এই নামে আমি কাউকে চিনি না।'

'ক্রিস্টাল বলটা ভাল করে একবার দেখুন,' বলল রানা। 'আজেবাজে লোকের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে কী পরিণতি হয় তা টের পাবেন।'

'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে চলে যেতে বলছি,' শান্ত সুরে বলল ম্যাডাম লেফকারা।

'আপনি মারাত্মক ভুল করছেন...'

ঘাড়ের পিছনে বাতাসের মৃদু স্পর্শ পেল রানা। একই সঙ্গে কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যান্ডস আপ! সাবধান, কোনও রকম চালাকি নয়!'

পিস্তল বের করবার সুযোগ নেই, ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল রানা। তারপর সাবধানে ঘাড় ফেরাল।

'ভুলটা তুমি করছ, মাসুদ রানা,' আবার শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠস্বর। অন্ধকার থেকে বাতির আলোয় বেরিয়ে এল সাদা লিনেন সুট পরা এক লোক, পানামা হ্যাটের ছায়া পড়েছে মুখে। চোখ দুটো শান্ত, শীতল; ডান হাতে ধরা .৩৮ অটোমেটিক-এর মতই ভীতিকর।

'সারপ্রাইয, সারপ্রাইয!' হালকা সুরে বলল রানা। 'আহমেদ রব্বানি, ধরে নিচ্ছি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল প্রতিপক্ষ, মুহূর্তের জন্য তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখা গেল। 'দুঃখিত, সিনর। আমার নাম আব্রাহাম। এই মুহূর্তে বেচারি রব্বানি খোলা সাগরে রয়েছে, গন্তব্য ইজরায়েল – স্যালামেস বন্দরে বিরাট কৃতিত্ব দেখিয়েছে সে, ওখানে বেচারিকে পুরস্কৃত করা হবে।' সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে।

রানা ভাবল, বেচারিকে?

'মানুষ তো আসল পুরস্কার পায় মারা যাবার পর, রব্বানিও

কি সেই আসল পুরস্কার নিতে যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল আব্রাহাম। 'না, সিনর, অত দূরে যেতে হবে না তাকে। মাটির পৃথিবীতেই আইল অভ ফ্লাওয়ার নামে আমাদের একটা বেহেশত রয়েছে...'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল ম্যাডাম লেফকারা। 'প্যাঁচাল বন্ধ করো তো! এই লোক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, একে যেন আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় আর না দেখি। চুক্তি করার সময় এই সব ঝামেলার ব্যাপারে কিছুই আমাকে জানানো হয়নি...'

কঠিন চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকাল আব্রাহাম। 'এই বুড়ি, চুপ!'

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে কামরার এক কোণে ছুঁড়ে মারল মোমদানিটা। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। পরক্ষণে ঠাস ঠাস করে দুটো শব্দ হলো, রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে আব্রাহাম।

তবে আগের জায়গায় নেই রানা, চেয়ার ছেড়ে নেমে এখন ক্রল করছে মেঝেতে, ইতোমধ্যে ওর হাতেও বেরিয়ে এসেছে নিজের পিস্তল।

ক্রল করে একটা সোফার পিছনে চলে এল রানা। .৩৮-এর মাজল ফ্ল্যাশ দেখেছে ও, সেদিকে পিস্তল তুলল। তবে গুলি করবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করে একটা দরজা ভেঙে পড়ল, করিডর থেকে উজ্জ্বল আলো ঢুকল কামরার ভিতর। সশস্ত্র আব্রাহামকে পরিষ্কার দেখা গেল সেই আলোয়, রানাকে খুঁজছে। আঁতকে উঠে ঘুরল সে। হাতের পিস্তল তুলতে যাচ্ছে, একটা বুলেট এসে লাগল তার কপালের ঠিক মাঝখানে। ছিটকে ম্যাডাম লেফকারার গায়ে পড়ল সে।

সোফার আড়াল থেকে সিধে হচ্ছে রানা, কামরার আলো জ্বলে উঠল। হাতে পিস্তল নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সিরিয়ান এজেন্ট আদনান মেনদেরেস, মাজল থেকে এখনও

নীলচে একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তাঁর কাঁধের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে জিমি মোরেল ও সার্জেন্ট নেকমেতিন।

ইউ.এন. আর্মড পুলিশ কর্মকর্তার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল কাফ্রি সরদার আর জিমি মোরেল ওয়েটিং রুমে বসে রয়েছে।

'কী খবর?' চেয়ার ছেড়ে একযোগে জানতে চাইল দুজন।

'সব ঠিক আছে,' বলল রানা।

মোরেল জানতে চাইলেন, 'আপনার কি মনে হয়, হের রানা, ওরা তার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারবে?'

'আব্রাহামের কথা বলছেন?' মাথা নাড়ল রানা। 'কয়েক মিনিট আগে হসপিটাল থেকে ফোন করা হয়েছে। সে মারা গেছে। কমিশনারদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছেন মিস্টার মেনদেরেস।'

'এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না, এ-সবের সঙ্গে হের মেনদেরেস ঠিক কোথায় খাপ খাচ্ছেন,' বললেন মোরেল। 'আপনার বিপদের সময় হাজির... আসলে কে তিনি, হের রানা?'

হাসল রানা। ওর ধারণা, ইউ.এন, আর্মড ফোর্স-এর কর্মকর্তাকে নিজের পরিচয় ও অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হয়েছে মেনদেরেসকে। এই এলাকায়, মানে সাইপ্রাস ও আশপাশের দ্বীপগুলোয় বিরাট কোনও ঝামেলা বাধার আশঙ্কা আছে, এরকম একটা রিপোর্ট পাওয়ার পর এখানে তাঁকে পাঠানো হয়েছে সেটা দেখার দায়িত্ব দিয়ে। তবে সে-সব তো আর মোরেলকে বলা যায় না।

'মিলিওনেয়ার সিরিয়ান ব্যবসায়ী,' বলল ও। 'আপনিই তো পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ওঁকে আমার সঙ্গে। বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বহু দেশে ভদ্রলোকের পুঁজি খাটছে। নাম-ডাক আছে, ব্যবসার গুডউইল আছে, পরিচয় দিলে সবাই নাকি তাঁকে চেনে। তা-ই বলেছিলেন না আপনি?'

মাথা ঝাঁকালেন মোরেল। বললেন, 'দেখা যাচ্ছে আপনাকে সাহায্য করতে গেলেও মানুষকে বিপদে জড়িয়ে পড়তে হয়। আমি নিজেও তো আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে মনে করে একটা লঞ্চ ভাড়া করে পিছু নিই...'

'ভালই করেছেন, ধন্যবাদ,' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'জেটির কাছে মিস্টার মেনদেরেসের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবার ব্যাখ্যা পেলাম। আপনারা দুজন যুক্তি করেই আমাদের পিছু নিয়েছিলেন।'

মাথা ঝাঁকালেন মোরেল। 'সারাটা পথ। ম্যাডাম লেফকারার বাগান থেকে করিডরে ঢুকছি, এই সময় গুলি হলো। দরজা না ভেঙে উপায় ছিল না।'

'ম্যাডাম লেফকারা,' বলল রানা। 'পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করার সময় আমাকে অভিশাপ দিয়েছে বুড়ি।'

'কোনও তথ্য দেয়নি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তার জায়গাটাকে শুধু মিটিং প্লেস হিসেবে ব্যবহার করা হত। ওদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না সে।'

ইউ.এন. পুলিশ কর্মকর্তার কামরার দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন আদনান মেনদেরেস।

'আসুন,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

ঠাণ্ডা রাতে বেরিয়ে এসে সৈকতের পথ ধরল ওরা। রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ইয়টে ফিরে গেল কাফ্রি সরদার, তার খুব ঘুম পেয়েছে। বাকি দুজনকে নিয়ে একটা কফি হাউসে ঢুকল রানা, বসল নিরিবিলি এক কোণে। আব্রাহামের মুখে রব্বানি সম্পর্কে কী শুনেছে বলল রানা ওদের। তিনজনের কেউই বুঝতে পারল না, কেন রব্বানিকে ধরে নিয়ে গেল ইজরায়েলি এজেন্টরা।

'এরপর?' জানতে চাইল রানা।

শ্রাগ করলেন মেনদেরেস। 'মনে হচ্ছে আমরা একটা পাঁচিলে

ধাক্কা খেয়ে আটকে গিয়েছি। আব্রাহাম মারা গেছে, এবং একমাত্র লিড এখন রয়েছে আইল অভ ফ্লাওয়ারের পথে – করুণাময় আল্লাহ্ তার হেফাজত করুন।'

'এই জায়গাটা সম্পর্কে বলুন, আইল অভ ফ্লাওয়ার,' বলল রানা।

সংক্ষেপে জানালেন ওদেরকে মোরেল।

ইজরায়েলের উপকূলে ছোট একটা দ্বীপ আইল অভ ফ্লাওয়ার, মেইনল্যান্ড থেকে একশো কিলোমিটার দূরে। খুদে বন্দরটার নাম আবুযার। কিছুদিন আগেও ডিপ সি ফিশিং স্টেশন ছিল, জেলেরাই শুধু আসা-যাওয়া করত। তবে প্রাচীন একটা পাথুরে দুর্গ আছে ওখানে, প্যালেস্টাইনি বন্দিদেরকে আটকে রাখা হয় ওখানে। বছর তিনেক হলো দ্বীপটাকে রীতিমত শহর বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

'এত থাকতে ওখানে কেন যাচ্ছে রব্বানি?' চিন্তা করছে রানা।

'নিশ্চয়ই পুরস্কার নিতে,' বললেন মোরেল।

মাথা নাড়ল রানা। তা হলে ওর ব্যাপারে অমন ঘটা করে 'বেচারি-বেচারি' করত না আব্রাহাম। কিছু না বলে মেনদেরেসের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল রানা।

'আমি যতটুকু জানি,' বললেন সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, 'কোনও মুসলমানকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়ার পর সাধারণত তাকে অঢেল টাকা পুরস্কার দেয় ইজরায়েলিরা।'

টেবিলে নীরবতা নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুললেন কেয়ার ফ্রির মালিক মোরেল, 'তা হলে দেখা যাচ্ছে, রব্বানিই এখন একমাত্র লিড?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অথচ এই মুহূর্তে তার বোট আবুযার বন্দরে ভিড়ছে।'

'সত্যি, কঠিন সমস্যা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মোরেল।

'এর কোনও সমাধান আমার অন্তত জানা নেই,' হাল ছেড়ে

দেওয়ার সুরে বললেন মেনদেরেস।

'আমার জানা আছে,' বলল রানা, তারপর ওয়েট্রেসকে ডেকে আরেক প্রস্থ কফি চাইল।

মেয়েটি চলে যাচ্ছে, নিচু গলায় মেনদেরেস জানতে চাইলেন, 'কী সমাধান, ইয়াং ম্যান?'

'আইল অভ ফ্লাওয়ারে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা।

'যিশু! যিশু!' ভয় পেয়ে চোখ বুজলেন মোরেল, প্রার্থনা করছেন। 'ওঁকে তুমি সঠিক পথ দেখাও, প্রভু! ইহুদিরা কী জিনিস সে তো তুমি জানোই, ক্রুসে তোলার আগে টের পেয়েছ হাড়ে হাড়ে। সুতরাং তোমাকেই ওঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'চুপ করুন!' ধমক দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন মেনদেরেস, তারপর ঝট করে রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনি কি পাগল হলেন, মিস্টার রানা?' ওর কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন তিনি। 'বহিরাগত যে-কোনও মুসলমানের জন্যে ওই দ্বীপ নরক ছাড়া কিছু নয়।'

যুক্তি দিয়ে মেনদেরেসকে বোঝাল রানা। 'ওদেরকে জানাবই না যে আমি মুসলমান,' বলল ও। 'আমেরিকা ইজরায়েলের জানি-দোস্ত্, আমি মার্কিন পাসপোর্ট নিয়ে যাচ্ছি। আমার শুধু দরকার হবে নিশ্ছিদ্র একটা কাভার স্টোরি।'

'মার্কিন পাসপোর্ট আপনি কোথায় পাবেন?' জানতে চাইলেন মেনদেরেস।

'সব বন্দরেই জাল পাসপোর্ট তৈরির দু'একটা কারখানা থাকে,' জবাব দিল রানা। 'আমার নাম রডরিক পেরেরা, মেক্সিকান ইমিগ্র্যান্ট।'

'আমরা আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিলেন মেনদেরেস। 'আপনি একা।'

কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেনদেরেস। 'আপনি বোকামি

করছেন, ইয়াং ম্যান। প্রথম কথা, বোট নিয়ে আপনি আবুযার বন্দরে ভিড়তেই পারবেন না। যদি বা পারেন, তীরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হবে আপনাকে।' মেনদেরেসের কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর ফুটল। এই কদিনেই দুঃসাহসী এই বিদেশি যুবককে ভাল লেগে গেছে তাঁর।

'কিন্তু আমি যতটুকু জানি,' বললেন মোরেল, 'আমেরিকান ও ব্রিটিশ ট্যুরিস্টরা ওই দ্বীপে অবাধে আসা-যাওয়া করছে, তাদেরকে কোনও রকম হয়রানি করা হয় না। বিভিন্ন দ্বীপ থেকে গ্রিকদেরও আসা-যাওয়া আছে।'

বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে ফিরলেন মেনদেরেস। 'কথাটা জেনে বলছেন, নাকি আন্দাজে?'

এই সময় ওদের জন্য কফি নিয়ে এল ওয়েট্রেস। চুপ করে গেল ওরা।

দু'মিনিট পর সিগারেট ধরাবার ফাঁকে হেসে উঠলেন মোরেল, তারপর বললেন, 'আমি নানা রকম ব্যবসা করি, মিস্টার মাসুদ রানা। ব্যবসার কাজে বহু খোঁজখবর রাখতে হয় আমাকে। মন্ডি আইল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে হার্মোনি নামে ছোট্ট একটা ফিশিং পোর্ট আছে, লোকজন সবাই তুর্কি ও গ্রিক সাইপ্রিয়ট। তারা বেশিরভাগই স্পঞ্জ ডাইভার ও ডিপ সি ফিশারম্যান। তাদের অনেকেই মাছ ধরে বেচতে নিয়ে যায় আইল অভ ফ্লাওয়ার আইল্যান্ডের আবুযার বন্দরে। ওরা গেলে খুশি হয় ইজরায়েলিরা, কারণ বড় মাছের সাপ্লাই আজকাল নেই বললেই চলে। ভাল দাম পায় গ্রিকরা।'

মেনদেরেসের দিকে ফিরল রানা। 'এ-সব আপনার জানা আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সিরিয়ান এজেন্ট। 'কিছুটা। হার্মোনি বন্দরে আমি নিজে কখনও যাইনি। যতটুকু শুনেছি, ট্যুরিস্টদের বিশেষ গুরুত্ব দেয় না তারা। গ্রিক ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথাও

বলতে চায় না। শুনেছি দুনিয়ার সেরা ডাইভার ওরা। হের মোরেল বোধহয় ঠিকই বলছেন।'

'ওদের সম্পর্কে এত কথা আপনি জানলেন কীভাবে?'

হাসলেন মেনদেরেস। 'ট্যুরিস্ট হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখবেন না।' জার্মান মোরেলের দিকে ফিরলেন, 'ওখানকার কাউকে চেনেন আপনি?'

মাথা নাড়লেন মোরেল। 'কী করে চিনব, কখনও গেলে তো! লোকমুখে যা শুনি, বললাম। তবে তথ্যগুলো যে সঠিক, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ, হের মোরেল,' বলল রানা।

নিজের কাপে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মেনদেরেস। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুলে বললেন, 'আপনার কি টাকা দরকার, মিস্টার রানা?'

মাথা নাড়ল রানা।

'জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে শুধু টাকা দিয়েই আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি, অন্য কোনওভাবে নয়।'

চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝির ঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাইরে। হারবারে ভেসে থাকা ফিশিং বোটগুলোর মাঝখানে হাহাকার করছে সাগরের বাতাস।

'আমাকে যদি হার্মোনি বন্দরে যেতে হয়, ভাল একটা কাভার স্টোরি দরকার হবে,' ওদের দিকে ফিরে বলল রানা। 'চলুন, অন্য কোথাও গিয়ে বসি। কফি নয়, গা গরম করার মত কিছু দরকার।'

'ঠিক,' বললেন মেনদেরেস। 'তবে কোথাও যাবার দরকার নেই।' প্যান্টের হিপ পকেট থেকে ছোট, চ্যাপ্টা একটা মেটাল কন্টেইনার বের করে টেবিলে রাখলেন তিনি। 'হুইস্কি।'

# আট

পরদিন ঠিক দুপুরের আগে হার্মোনি বন্দরে পৌঁছাল ফরচুনা। হুইলে রয়েছে কাফ্রি সরদার, ডেক-হ্যান্ড হিসাবে সাহায্য করছে তাকে বুড়ো খিজির হায়াত। রেইল-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, মাথায় পানামা হ্যাট, হালকা ট্রপিকাল সুটে দারুণ স্মার্ট লাগছে ওকে দেখতে।

হেডল্যান্ডকে ঘিরে ঘুরছে ফরচুনা। সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলোর সামনে লোকজনের ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। উল্টোদিক থেকে একটা রোয়িং বোট আসছে, বাতাসে ফুলে আছে পাল। এত কাছ দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে, দুষ্ট আত্মাকে ভয় দেখাবার জন্য আঁকা বো-র দুদিকে বিরাট চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা।

সৌজন্যবশত হাত তুলে নাড়ল রানা, কিন্তু টিলার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা গ্রাহ্যই করল না ওকে। ব্যাপারটা লক্ষ করে রেইলের উপর দিয়ে সাগরে থুথু ফেলল কাফ্রি সরদার। 'এদিকে এরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলে, মিস্টার রানা।'

খুব সাবধানে হারবারে ঢুকছে ফরচুনা, গতি মন্থর। গভীর সাগরে মাছ ধরতে যায় এমন কয়েকটা লঞ্চ দেখা গেল জেটিতে। তবে সৈকতে রোয়িং বোটের কোনও অভাব নেই। ওগুলোর পাশে বসে জাল মেরামত করছে জেলেরা। অগভীর পানিতে ছুটোছুটি করে খেলছে ছোট ছেলেমেয়েরা।

কেবিনে ঢুকল রানা। টেবিলের উপর থেকে দুই সাইজের

দামি দুটো ক্যামেরা তুলে ঝোলাল বাম কাঁধে। পকেট থেকে বের করে সান গ্লাস পরল চোখে। তারপর টেবিল থেকে ক্যানভাস-গ্রিপটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকে।

এরইমধ্যে কাঠের জেটিতে ভিড়েছে ফরচুনা। ইঞ্জিন বন্ধ হলো। প্রখর রোদের মধ্যে হঠাৎ আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল। দুজন তরুণ রেইলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে, সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে ধীরে ধীরে। নিচু পাঁচিলে বসে ঝিমাচ্ছে তিন বুড়ো।

তরুণদের দিকে রশিটা ছুঁড়ে দিল খিজির হায়াত, কিন্তু তারা সেটা ধরল না। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল বুড়ো, রেইল টপকে লাইনটা তুলল, তারপর একটা খাটো পিলারে জড়াল। সিধে হচ্ছে সে, চোখের কোণ দিয়ে দেখল তরুণ দুজন ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ভাব-ভঙ্গি বিশেষ সুবিধের নয়, বোধহয় চাঁদা চাইবে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা, সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে বুড়ো খিজির হায়াতের পিছনদিকে। তাদের দৃষ্টিতে ঠিক ভয় না থাকলেও, সমীহের ভাব অবশ্যই আছে।

ঘাড় ফেরাতে ঠিক পিছনেই রানাকে দেখতে পেল খিজির হায়াত, টেরও পায়নি বিড়ালের মত নিঃশব্দে রেইলিং টপকে চলে এসেছে কখন।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা, একটা ক্যামেরা তুলে তরুণদের ফটো তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'কই, কিছু না!' তরুণদের একজন বলল, তারপর একযোগে ঘুরল তারা, দ্রুত পা চালিয়ে জেটি থেকে নেমে গেল। চাঁদাবাজ বলেই হয়তো ক্যামেরাকে খুব ভয় পায়।

হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে সরদার বলল, 'দেড়-দু'ঘণ্টা চারদিকে ঘোরাফেরা করি, মিস্টার পেরেরা, যদি কিছু চোখে পড়ে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কাজের মধ্যে কখন কোথায় থাকি, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, সরদার। ফরচুনার দিকে লক্ষ রাখবেন, ওটার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। ওটা অক্ষত থাকা দরকার।'

জেটি থেকে নেমে সৈকত পেরুল রানা, শহরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। পরিবেশটা একটু বেশি শান্ত, যেন কিছু একটা ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। কাছাকাছি কে যেন গান গেয়ে উঠল। আওয়াজটা অনুসরণ করে একটা বার-এ ঢুকল ও।

প্রবেশপথের ঠিক ভিতরেই দেয়াল ঘেঁষে ফেলা একটা চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে রয়েছে সুদর্শন এক স্বাস্থ্যবান ছোকরা, বিশ কি একুশ বছর বয়েস হবে। সুরেলা কণ্ঠে গাইছে সে, সেই সঙ্গে একটা লিউট-এর তারে টোকা দিচ্ছে নরম হাতে।

রানাকে দেখল ছেলেটা, তবে নড়ল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার লম্বা করা পা দুটো টপকে ভিতরে ঢুকল রানা। ভিতরটা গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। ঠাণ্ডা পরিবেশ। মার্বেল পাথরের তৈরি বার। একটা টেবিলে বসে আছে তাগড়া চেহারার তিন জেলে।

বারের পিছনে বসা লোকটা মাঝবয়েসী। তার দিকে এগোচ্ছে রানা, সব কথাবার্তা থেমে গেল। ক্যানভাস গ্রিপ ও ক্যামেরা দুটো কাউন্টারে নামিয়ে রাখল ও। 'ঠাণ্ডা বিয়ার হবে?' বলল ও, খটমটে গ্রিক ভাষায়।

হাসল বারম্যান। কাউন্টারের উপর ঠক করে মগ রেখে ফ্রিজ থেকে বের করল চিল্ড্ লাগারের বোতল। দক্ষ হাতে বোতলের মুখ খুলে উপচে ওঠা ফেনা সামলে মগটা কাত করে ধরে সাবধানে ঢালল বিয়ার। 'জার্নালিস্ট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দু'একদিন থাকতে হতে পারে। ভাল একটা কামরা দরকার। ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'কেন পারব না! ফার্স্ট ক্লাস হয়তো নয়, তবে খানাটা এ-প্লাস।'

তারে জোরে আঘাত পড়ায় কর্কশ আওয়াজ তুলল লিউট, শুনে হেসে উঠল টেবিলের লোকগুলো। তাদের একজন ছেলেটার উদ্দেশে বলল, 'ও হে, অ্যাডোনিস, সৌখিন ভদ্রলোকের চেহারা ভাল লাগেনি তোমার? ভাবছ, রাতের আঁধারে সৈকতে প্রেম করার দিন বুঝি শেষ হয়ে গেল তোমার?'

কটমট করে চাইল ছোকরা লোকটার দিকে, তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল রানার দিকে।

'এই ব্যাটা আমার পা ডিঙিয়ে ঢুকেছে ভেতরে!'

'তুমি পা ছড়িয়ে দরজা আগলে রাখলে ডিঙাবে না?' হাসিমুখে বলল টেবিলের একজন। একটা ঝগড়ার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল।

'চুপ করো!' ধমকে উঠল অ্যাডোনিস। দেয়ালে ঠেস দিয় রাখল লিউটটা। 'দেখে রাখো, তার ফলটা কী হয়!'

সারা দুনিয়ার জেলে-নাবিকরা যেমন হয়, এরাও তেমনি কঠিন ও কর্কশ প্রকৃতির; কিছুটা যুদ্ধবাজও। কাজের শক্ত ধরনই তাদেরকে এভাবে গড়ে তোলে। অচেনা লোককে সহজে তারা মেনে নিতে চায় না। তাই তারাও চাইছে একটু নাজেহাল হোক বিদেশি মোমের পুতুলটা।

ঘুরল রানা, চোখ থেকে সান গ্লাস নামিয়ে ওদের দিকে শান্ত ভঙ্গিতে তাকাল। টেবিলে বসা লোকগুলোর হাসি ম্লান হলো একটু, আগের চেয়ে নিচু গলায় কথা বলছে।

কাউন্টারের দিকে ফিরে বিয়ারের মগে চুমুক দিচ্ছে রানা, শুনতে পেল ছেলেটার উদ্দেশে চাপা গলায় ওদের একজন বলছে, 'বোঝা গেল অ্যাডোনিস কোনও কম্মের নয়, স্রেফ বাতাস ভর্তি একটা বেলুন।'

লাফ দিয়ে সিধে হলো ছেলেটা। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল সে, তারপর বার বরাবর হেঁটে এসে রানার কনুইয়ে ধাক্কা দিল, ঠিক যখন মগটা ঠোঁটের কাছে তুলেছে ও।

বারের উপর ছলকে পড়ল বিয়ার। মগটা নামিয়ে রেখে তার

দিকে ঘুরল রানা, শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘যা হবার হয়েছে। এক মগ বিয়ার কিনে দিলে ব্যাপারটা আমি মনে রাখব না, ভুলে যাব।’

‘মনে রাখলেই বা কে কেয়ার করে? আহ্লাদ হচ্ছে, না?’ হিস হিস করে বলল অ্যাডোনিস, ‘নিজে কিনে খাও।’

‘এক কথা আমি কিন্তু দুবার বলি না,’ সাবধান করবার সুরে বলল রানা। ‘ভাল চাও তো বিয়ারের অর্ডার দাও।’

‘তা না হলে কী করবে, গায়ে হাত তুলবে?’ দুই হাত কোমরে রেখে বুক ফুলিয়ে জানতে চাইল অ্যাডোনিস, চোখে-মুখে তাচ্ছিল্য। ‘তোমার মতন বিদেশি চালবাজ বহুত দেখা আছে আমার...’

ঠাস করে যেন পটকা ফাটার আওয়াজ হলো। চড় খেল, না ঘুসি, কিছুই বলতে পারবে না ছেলেটা, শুধু টের পেল ছিটকে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে সে। আর প্রচণ্ড ব্যথা করছে ওর ডানদিকের চোয়ালটা।

দেয়াল থেকে মেঝেতে পড়ল ছেলেটা। শকটা সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে। হিপ পকেট থেকে চকচকে একটা ছুরি বেরিয়ে এল হাতে, ফলাটা ছয় ইঞ্চির কম নয়। হঠাৎ লাফ দিল সে, ছুরি চালাল রানার পেট লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে যাওয়ার সময় খপ করে কবজি ধরে মোচড় দিল রানা, তারপর একটানে তুলে আনল হাতটা ওর পিঠের উপর প্রায় ঘাড়ের কাছাকাছি। তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে ছেলেটা, মুঠো আলগা করে ছেড়ে দিল হাতের ছুরি। ঝন-ঝন শব্দে পড়ল সেটা মেঝেতে। এবার হাত ছেড়ে দিয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে কষে এক লাথি মারল রানা ওর নিতম্বে। ছিটকে জেলেদের টেবিলের উপর গিয়ে পড়ল সে।

ছেলেটার ধাক্কা খেয়ে তিন খদ্দের ও তাদের ড্রিঙ্কস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ‘বড়দের সঙ্গে লাগতে আর কখনও দুধের শিশু পাঠিয়ো না,’ ওদের ভাষাতেই বলল রানা।

কারও মুখে কথা নেই। মেঝেতে ছিটকে পড়া লোকগুলো

ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে, বারম্যান একটা হকি স্টিক হাতে নিয়ে কাউন্টার টপকে এপারে বেরিয়ে এল। ‘যে-ই গোলমাল করবে, আমি তার খুলি ফাটাব। খানিকটা মজা করতে চেয়েছিলে তোমরা, কিন্তু ভুল করে ফেলেছ। যা হবার হয়েছে, এখানেই শেষ করো।’

যে যার চেয়ার সিধে করে আবার বসল লোকগুলো। ছেলেটা সিধে হয়ে ঘুরল, তারপর দুপদাপ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে। বারম্যান হাসিমুখে ফিরল রানার দিকে। ‘আমি লুকা মাইলস্। বিদেশি মানুষ, অথচ আপনার গ্রিক খুব ভাল।’

‘রডরিক পেরেরা, আমেরিকান-মেক্সিকান।’

‘আরেক গ্লাস বিয়ার, মিস্টার পেরেরা? আমার তরফ থেকে।’

খদ্দেরদের একজন, গায়ে নীল শার্ট, বলল, ‘আপনার মত গ্রিক বলতে পারে এমন লোকের সঙ্গে আমার কোনও বিবাদ নেই।’

‘আমারও নেই,’ সমস্বরে বলল বাকি দুজন।

‘থ্যাঙ্কিউ,’ বলল রানা নরম গলায়। তারপর লুকা মাইলসের দিকে ফিরে বলল, ‘না, মিস্টার মাইলস। আমার কারণে সবার ড্রিঙ্কস নষ্ট হয়েছে। আমি চাই ক্ষতিপূরণটা আমিই দেব। আমাদের সবার জন্যে একমগ করে বিয়ার। ঠিক আছে?’

‘ভেরি গুড,’ বলে টেবিলে বিয়ার পরিবেশন করল মাইলস্, আরও একটা চেয়ার টেনে আনা হলে রানা বসল। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল ওরা।

নিজের গ্লাসটা নামিয়ে রাখছে রানা, নীল শার্ট জানতে চাইল, ‘আপনি এখানে মাছ ধরতে এসেছেন?’

‘আমি একজন ফটো-জার্নালিস্ট। আমেরিকার নাম করা একটা ম্যাগাজিন ফটো-ফিচার করতে পাঠিয়েছে আমাকে।’

‘হার্মোনি বন্দরকে নিয়ে?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ইজরায়েল ও আশপাশের দ্বীপগুলোকে

নিয়ে। তারা আমাকে আবুযার নামে একটা জায়গায় যেতে বলে দিয়েছে। সেখানে ইহুদি-খ্রিশ্চান-মুসলমানরা সবাই মিলেমিশে আছে কি না দেখতে হবে আমাকে, প্রচুর ছবিও তুলতে হবে।'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা। একজন তার হাতের গ্লাস উঁচু করে বলল, 'গুড লাক, মাই ফ্রেন্ড, ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

'কী ব্যাপার, কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল রানা।

'আজকাল আবুযারে কেউ যায় না, এই আর কী।'

'কিন্তু গ্রিক সাইপ্রাসে অন্য রকম শুনেছি আমি,' বলল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে এখান থেকে প্রায়ই লোকজন আবুযারে আসা-যাওয়া করছে। প্রচুর মাছ বিক্রি—'

'সেটা গত বছরের কথা। আগের সেই পরিবেশ আর নেই।'

পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে টেবিলের উপর রাখল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে যত টাকাই লাগুক, সরেজমিনে খোঁজ-খবর নিয়ে ফিচারটা তৈরি করতে হবে।'

হেসে উঠল নীল শার্ট। 'আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে। টাকা দিয়ে কাউকে বিপজ্জনক কিছু করাতে হলে একজন নিঃস্ব মানুষকে বেছে নাও।'

বাকি দুজনও হেসে উঠল। তারপর তাদের একজন বলল, 'মোল্লা বখতিয়ারকে বলে দেখতে পারেন। সে বোধহয় মরতেও আপত্তি করবে না।'

টেবিল ছেড়ে বারের দিকে এগোল রানা। 'শুনলেন, মাইলস্?'

মাথা ঝাঁকাল লুকা মাইলস্। 'ঠিকই বলছে ওরা। এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা, আমাদের মাছ ভর্তি বোটগুলো প্রতিদিন আইল অভ ফ্লাওয়ারে যাচ্ছিল। কিন্তু আবুযারে দুটো আত্মঘাতী বোমা হামলার পর সব একেবারে রাতারাতি বদলে গেছে।'

‘কারা দায়ী?’

‘হিযবুল্লাহ।’

গম্ভীর হলো রানা। ‘হুম। তারপর থেকে ইজরায়েলিরা আপনাদেরকে তাদের দ্বীপে যেতে মানা করে দিয়েছে?’

মাথা নাড়ল মাইলস্। ‘ঠিক তা নয়, তবে পরিবেশটা বদলে গেছে। কেউ বলতে পারে না কার সঙ্গে কী আচরণ করবে তারা। কেউ আসলে তার বোট হারাবার ঝুঁকি নিতে চায় না।’

‘মোল্লা বখতিয়ারের কথা বলছে এরা, কে সে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল মাইলস্। ‘মিথ্যেকথা বলব না, মুসলমান হলে কী হবে, খুব ভাল এক বুড়ো। তামান্না নামে একটা মোটর ক্রুযার চালায় মোল্লা বখতিয়ার। একটাই ছেলে, গত বছর ডুবে মারা গেছে। মেয়েও একটা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল।’ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

‘তারপর?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে বখতিয়ারের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এর মধ্যে মারা গেল ছেলেটা। একা মাছ ধরে সুবিধে করতে পারছিল না। মাস তিনেক আগে ছুটিতে দেশে ফিরে বাপের অবস্থা দেখে বেঁকে বসেছে মেয়ে, আমেরিকায় আর ফিরবে না। সেই থেকে বাপকে মাছ ধরতে সাহায্য করছে।’

‘কী ধরে ওরা, টিউনা?’

মাথা নাড়ল মাইলস্। ‘আগে ধরত, এখন আর ধরে না। মাইল দশেক পশ্চিমে আয়াজ দ্বীপের কাছাকাছি একটা রিফ আছে, বুড়ো বখতিয়ার সেখানে মাদার অভ পার্ল পেয়েছে। ডাইভ দিয়ে এখনও বোধহয় ওগুলোই তুলছে সে।’

‘নিশ্চয়ই বয়স্ক মানুষ,’ বলল রানা। ‘পানি ওখানে কতটা গভীর?’

‘সতেরো-আঠারো ফ্যাদম হবে। যে সুটটা ব্যবহার করছে, কমকরেও চল্লিশ বছরের পুরানো।’

‘এ তো স্রেফ পাগলামি।’

‘আসলে বোটটা হারাতে চায় না বখতিয়ার। ওই বোট আর মেয়ে, দুনিয়ায় এই দুটো জিনিস ছাড়া কিছুই নেই তার।’

‘আপনার কী মনে হয়, আমাকে আবুযারে নিয়ে যেতে রাজি হবে সে?’

কাঁধ ঝাঁকাল মাইলস্। ‘তার টাকা দরকার, এটুকু আমি বলতে পারি। তাকে আপনি বলে দেখতে পারেন।’

‘ধন্যবাদ। এবার আপনার কামরাটা দেখব।’

*

বারো ফুটি একটা লঞ্চ আছে লুকা মাইলসের, খুব আগ্রহের সঙ্গে চালকসহ ভাড়া দিতে রাজি হলো। শাওয়ার সেরে, কাপড় পাল্টে, উপাদেয় লাঞ্চ সেরে দু’ঘণ্টা পর সাগরে ভাসল রানা।

হাতে জরুরি কাজ না থাকলে ওর সঙ্গে যেত মাইলস্। কীভাবে, কোন্ পথে যেতে হবে রানাকে বুঝিয়ে দিল সে।

সাগর যেন কাঁচ, নিষ্কলুষ নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে দিগন্তে। সুইং চেয়ারে বসে এক হাতে হুইল ধরে আছে রানা, আরেক হাতে বিনকিউলার, চোখে তুলে মাঝে মধ্যে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে রানা। ফরচুনাকে ফেরত পাঠিয়েছে ও স্যালামেস বন্দরে।

চল্লিশ মিনিট লাগল ফায়াজ দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে আসতে। ওটাকে ঘিরে বাঁক নিতেই, সিকি মাইল দূরে, মোটর ক্রুযারটাকে দেখতে পেল রানা। লঞ্চের গতি কমিয়ে সেটার দিকে এগোতে বলল ও সারেংকে।

তারপর শুনতে পেল একঘেয়ে ছন্দে বাঁধা যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে চলছে একটা পাম্প, নীল পানির ভিতর দিয়ে সাগরের তলায় বাতাস পাঠাচ্ছে – তার মানে তলায় কেউ আছে।

বিশ্বাস করা কঠিন যে মান্ধাতা আমলের ক্যানভাস সুট এখনও

কেউ ব্যবহার করে, বিশেষ করে কমপ্রেসড এয়ার সিলিন্ডার-এর এই যুগে। অ্যাকুয়ালাঙ সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ, ডাইভার সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পারে।

আরও কাছাকাছি হতে মেয়েটিকে দেখতে পেল রানা। লম্বা, একহারা। টকটকে লাল শার্ট ও ক্যানভাস জিনস পরেছে। লম্বা চুল বেণী করে ঝুলিয়ে রেখেছে পিঠে। একমনে লাইফ-লাইন ক্র্যাঙ্ক-এর হাতল ঘোরাচ্ছে, টেনে তুলছে বুড়ো বাপকে, রানার উপস্থিতি সম্পর্কে এতটুকু সচেতন নয়।

একেবারে হঠাৎ করে ক্র্যাঙ্ক-এর হাতল জ্যাম হয়ে গেল, ঘুরছে না। টানাটানি শুরু করল মেয়েটা, কাজ হলো না। উঠে রেইলের কাছে চলে এসে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল। দেখবার কিছু নেই। আবার ক্র্যাঙ্কের কাছে ফিরে গেল সে, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে। বৃথাই। অস্থিরতা বাড়ছে তার, রেইল টপকে ডাইভ দিল পানিতে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে মোটর ক্রুযারের পাশে চলে এল লঞ্চ। লঞ্চের লাইনটা দ্রুত হাতে বেঁধে লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্কের পাশে পড়ল রানা, হাতলটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছে। এক সময় মনে হলো ভেঙে যাবে ওটা, তবু ঘুরবে না।

হাল ছেড়ে দিয়ে রেইলে এসে দাঁড়াল রানা, ঠিক এই সময় মইয়ের কাছাকাছি পানিতে মাথা তুলল মেয়েটি, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। কীভাবে যেন তার বেণী খুলে গেছে, কালো মখমলের মত একরাশ চুল তার চারপাশের পানিতে ভাসছে। হাত বাড়িয়ে রেইল টপকাতে তাকে সাহায্য করল রানা।

'নীচে কোনও সমস্যা হয়েছে?'

হতভম্ব দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। 'আব্বুর নাগাল পাচ্ছি না! আব্বুকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না!'

'কত নীচে?'

'দশ-বারো ফ্যাদম... বেশিও হতে পারে। আমি আবার

নামছি।' সিধে হলো মেয়েটি, রেইলের দিকে ঘুরছে।

এই সময় বাতাসের বিরাট একটা বুদ্বুদ বিস্ফোরিত হলো সারফেসে। বসে পড়ল রানা, পায়ের জুতো আর জ্যাকেট খুলছে। 'তুমি ক্র্যাঙ্কের কাছে থাকো,' মেয়েটিকে বলল ও। 'লাইনটা সম্ভবত মরা প্রবাল কিংবা কোনও শিকড়ে জড়িয়েছে। আমি সিগনাল দিলেই টান দিয়ো লাইফ-লাইনে।'

হুইলহাউসের ছাদে উঠল রানা। কয়েক সেকেন্ড কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকল, যতটা পারা যায় বাতাস ভরে নিচ্ছে ফুসফুসে। তারপর ডাইভ দিল।

পানির গভীরতা রোদকে ফিল্টার করছে, শুঁষে নিচ্ছে লাল ও কমলা রশ্মি। বিরাট একটা পাহাড়-প্রাচীরকে সামনে রেখে পঞ্চাশ ফুট নেমে এল রানা। এখানে দৃষ্টিসীমা কিছুটা ভাল, তবে সমস্ত রঙ অদৃশ্য হয়েছে।

ষাট ফুটে নেমে দেখল লাইনটা প্রবালের কুৎসিতদর্শন একটা পিলারে জড়িয়ে রয়েছে, সেটার গায়ে গাছের পাতার মত অসংখ্য ধারাল পাত দেখা যাচ্ছে। লুপ ও প্যাঁচ খুলে দ্রুত আরও নীচে নামল রানা।

পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে, একটা কারনিসে বসে থাকতে দেখা গেল বুড়ো মোল্লা বখতিয়ারকে। সন্দেহ নেই নিজেই প্যাঁচটা খোলার চেষ্টা করেছিল, ফলে প্রবালের ধারাল পাতায় লেগে চিরে ফাঁক হয়ে গেছে তার মান্ধাতা আমলের ক্যানভাস সুট । সুটের ভিতর জোর করে ঢুকে পড়েছে পানি, এবং শুধু বিরাট ব্রোঞ্জের হেলমেটে বিরতিহীন বাতাস পাম্প করায় চেস্ট লেভেলে আটকে রাখা গেছে সেই পানিকে।

ইতোমধ্যে রানার চোখে সব কিছু ঝাপসা লাগছে। জোরে একটা টান দিল লাইফ-লাইনে। তার আগে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটাকে মুহূর্তের জন্য অস্পষ্টভাবে দেখে নিয়েছে। সিগনাল পাওয়ার তিন সেকেন্ড পর সাড়া দিল মেয়েটি। উপরে

উঠতে শুরু করল রানা, মোল্লা বখতিয়ারকে টেনে আনছে।

কানের ভিতর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে রানা। মনে হলো কাছাকাছি কোথাও অনেকগুলো ঘণ্টা বাজছে, একই সঙ্গে যেন ড্রাম পেটানোর আওয়াজ আঘাত করছে শরীরে।

অনেক উপরে তামান্নার খোলটা দেখতে পেল রানা। মোল্লা বখতিয়ারকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত সাঁতরে উপরে উঠছে, সঙ্গে থাকছে রাশি রাশি বুদ্বুদ।

মইটার পাশে মাথা তুলল রানা। কয়েক সেকেন্ড জিরিয়ে নিয়ে রেইল টপকে দেখল ক্র্যাঙ্কের হাতলটা প্রাণপণে ঘোরাচ্ছে মেয়েটি, মুখ থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরছে।

'আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আব্বু আসছে!'

হাত ও পা ব্যথা করছে রানার। বুকে মারাত্মক একটা চাপ। গোটা জগৎ যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও যত জোরে পারা যায় লাইনটা টানছে ও।

মইটার পাশে মাথা তুলল মোল্লা বখতিয়ার। তার মেয়ে ও রানা, দুজন মিলে রেইলের উপর দিয়ে তুলে আনল তাকে। ডেকে শুয়ে মড়ার মত নেতিয়ে পড়ল লোকটা।

ব্রোঞ্জ হেলমেটের স্ক্রু খুলতে দেখছে রানা মেয়েটিকে, এই সময় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। আবেগে অস্থির হয়ে ওকে কিছু বলছে মেয়েটি, আওয়াজটা যেন একটা টানেলের ভিতর দিয়ে বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। পরমুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

# নয়

খালি হতেই রানার মগটা আবার ভরে দিল আইরিন। আগুনের মত গরম কফি, জিভ ও তালুতে ফোস্কা পড়বার উপক্রম করল। তবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পেটে নেমে যাওয়ার পর, প্রাণ ফিরে পাওয়ার অনুভূতি হলো রানার।

কেবিন ছেড়ে গ্যালিতে চলে গেল মেয়েটি, মগের কিনারা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। তার একহারা, প্রায় কিশোরসুলভ কাঠামোয় রমণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও সেভাবে ফোটেনি। তবে ঠোঁট জোড়ার কথা আলাদা – এত প্রাণবন্ত, যে-কোনও পুরুষকে আকৃষ্ট করবে।

ঘুরল আইরিন, লক্ষ করল রানা তাকে দেখছে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আপনার ভাল লাগছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ডিকমপ্রেশন-এর জন্যে সময় দিতে পারিনি, সমস্যা তো হবেই। অবশ্য এক-আধবার এরকম হলে তেমন কোনও ক্ষতি হয় না।'

'প্রায়ই হলে বিপদ আছে,' বলল মেয়েটি। 'গাফফার চাচাকে বেন্ড-এর কারণে মারা যেতে দেখেছি, আমার তখন বারো বছর বয়েস। সে বড় করুণ দৃশ্য।'

কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কেবিনে ঢুকল মোল্লা বখতিয়ার। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে, বয়স হবে সত্তরের কম নয়, তবে শরীরটা এখনও শক্ত-সমর্থ। বসল সে। পুরানো একটা ব্রায়ার পাইপে তামাক ভরছে। 'কেমন আছেন, বাপ?' জানতে চাইল সে।

'মারা যাচ্ছি না,' কৌতুক করে বলল রানা।

'তা হলে বলতে হবে আপনার ভাগ্যটা নেহাতই ভাল। আমি নিশ্চয়ই সত্তর ফুট নীচে ছিলাম। ফ্রি ডাইভে অত নীচে খুব কম

লোকই নামতে পারে।'

'কিছু লোক একশো পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত নামে, শুনেছি,' বলল রানা। 'তবে তলায় দ্রুত পৌঁছানোর জন্যে লিড ওয়েট ব্যবহার করে তারা।'

'আপনি অভ্যস্ত, প্রায়ই ডাইভ দেন?'

'মাঝে-মধ্যে, তাও অ্যাকুয়ালাঙ নিয়ে। খুন করে ফেললেও আপনার ওই গিয়ার আমাকে পরাতে পারবেন না।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা থেকে একটাই ভাল ফল পাওয়া গেছে, মৃত্যু ফাঁদটা আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন।'

'সুটটার কথা বলছেন?' মোল্লা বখতিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওটা খুব সহজেই আমি মেরামত করে নিতে পারব।'

গ্যালিতে বসে স্যান্ডউইচ কাটছিল আইরিন, বাপের কথা শুনে দ্রুত এগিয়ে এল সে। 'না, আব্বু। ওটা তুমি আর কোনওদিন ব্যবহার করতে পারবে না।'

'তুই চাস তামান্নাকে নিয়ে যাক নিকোলাই?' মেয়ের হাতটা ধরল বুড়ো। 'আমাদেরকে বাঁচতে হবে, মা। আর কী করার আছে আমার, বল!'

তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল আইরিন। রানার দিকে ফিরে হাসল বখতিয়ার, প্রসঙ্গটা বদলে ফেলল। 'আল্লাহ আপনাকে ঠিক সময় মত পাঠিয়েছিলেন।'

'আমার আসাটা কিন্তু দৈবাৎ নয়,' বলল রানা। 'এমন একজনকে খুঁজছি আমি যে আমাকে আবুযারে নিয়ে যেতে পারবে। লুকা মাইলস্ বললেন আপনি রাজি হতে পারেন।'

'আবুযার, মানে আইল অভ ফ্লাওয়ারে?' সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা বখতিয়ারের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'কেন আপনি সেখানে যেতে চান?'

'আমি ফ্রি-লান্স ফটোগ্রাফার। এলাকার দ্বীপগুলোর ওপর ফটো-ফিচার তৈরি করছি, একটা মার্কিন ম্যাগাজিনে ছাপা হবে।

শুনেছি হার্মোনি বন্দরের বোট মাঝে-মধ্যে মাছ নিয়ে আবুযারে যায়। এথেন্সে কিছুদিন ছিলাম, গ্রিকটা মোটামুটি শেখা আছে।'

'হ্যাঁ, আসা-যাওয়া তো ছিলই। মাছের সবচেয়ে ভাল দাম দিত ওরা। কিন্তু হিযবুল্লাহ আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাবার পর সেই অবস্থা আর নেই। সিকিউরিটি যে খুব কড়া, তা নয়; ইজরায়েলিরা কখন কী আচরণ করবে তার কোনও ঠিক নেই। ওরা আমার বোট রেখেও দিতে পারে।' মাথা নাড়ল মোল্লা বখতিয়ার। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমার ঋণ কিছুটা শোধ হত, মিস্টার পেরেরা। তবে এবার সেটা সম্ভব নয়।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে খুলল রানা। 'মার্কিন ডলার,' বলে এক তাড়া নোট দেখাল বুড়োকে। 'পাঁচশো, হাজার, আপনি শুধু মুখ ফুটে বলুন কত।'

সশব্দে দম আটকাল আইরিন। 'এই টাকায় নিকোলাইয়ের পাওনা শোধ হয়ে যাবে, আব্বু। আমাদের আর কোনও চিন্তা থাকবে না।'

যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, নোটগুলোর উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না মোল্লা বখতিয়ার। 'আবুযারে গেলে বোটটা আমাকে হারাতে হতে পারে,' বলল সে। 'কিন্তু নিকোলাইয়ের দেনা শোধ করার জন্যে অন্তত চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সময় পাব হাতে।'

'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন।' টাকা সহ মানিব্যাগটা পকেটে রেখে দিল রানা। কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে এল ও, রেইলিঙে ভর দিয়ে সাগর দেখছে। ভাবল, হার্মোনিতে ফিরে অন্য কাউকে ধরতে হবে।

এক মুহূর্ত পর ওর পাশে এসে দাঁড়াল আইরিন। 'সত্যি দুঃখিত। জানি আপনার প্রতি ঋণী আমরা, সেটা শোধ করার সুযোগ হাতছাড়া করছি। কিন্তু এই বোটটাই আব্বুর জীবন, তাই এটা হারাবার কথা ভাবতে পারে না।'

‘নিকোলাইয়ের দেনা শোধ করতে কত টাকা লাগবে?’ জানতে চাইল রানা।

উত্তর দিতে যাবে আইরিন, হঠাৎ ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও তাকাল।

এখনও বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে স্পিডবোটটা, তবে দ্রুত বেগে এদিকেই আসছে সেটা। কী দেখল কে জানে, ত্রস্ত পায়ে ডেক থেকে নীচে নেমে গেল আইরিন। একটু পরেই বাপকে নিয়ে ফিরে এল সে।

রেইলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল মোল্লা বখতিয়ার, কপালে চিন্তার রেখা। ‘দেখে মনে হচ্ছে নিকোলাই আসছে,’ বলল সে। ‘কী চায় ও?’

স্পিডবোটটা অ্যাডোনিস চালাচ্ছে। নিকোলাই লম্বা-চওড়া এক লোক, তবে গায়ে প্রচুর মেদ। তার বগলের নীচে লিনেন-এর জ্যাকেট ঘামে ভিজে গেছে। মই বেয়ে উঠে এল সে। অ্যাডোনিস হুইলে থাকল।

‘কী চাই তোমার?’ কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল মোল্লা বখতিয়ার।

একটা রুমাল বের করে টাক মাথার ঘাম মুছল নিকোলাই। ‘শোনো, বুড়ো শকুন, তুমি আমার সঙ্গে এই সুরে কথা বলবে না। তিনদিন ধরে আমি তোমার নাগাল পাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু নানা কৌশলে তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ।’

‘তোমার সঙ্গে কথা হবে মাসের শেষ তারিখে। তার আগে আমার কিছু বলার নেই।’

‘এখানেই ভুল করছ তুমি,’ বলল নিকোলাই। ‘আমি সময় বাড়িয়েছিলাম দয়া করে।’ চট করে আইরিনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। ‘আমার আশা ছিল বাস্তব পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তুমি আমার বন্ধুর প্রস্তাবে রাজি হবে। কিন্তু পানি তো সেদিকে গড়ায়নি।’

রাগে লাল হয়ে উঠল মোল্লা বখতিয়ারের মুখ। 'কী বলার আছে বলে আমার বোট থেকে বিদায় হও তুমি।'

'তুমি বলতে চাইছ – আমার বোট,' বলল নিকোলাই। হাতের ব্যাগ খুলে একটা ডকুমেন্ট বের করল সে। 'এই চুক্তিতে লেখা আছে আগামী শুক্রবার দুপুরের মধ্যে সুদসহ আমার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে। বারোশো মার্কিন ডলার।'

'শুনলাম,' বলল মোল্লা বখতিয়ার। 'এবার বিদায় হও।'

'এখনও সময় আছে,' নরম সুরে বলল নিকোলাই। 'ইবনে শাইখের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়েটা পড়িয়ে দিলে এই দেনা সে-ই শোধ করবে।'

হঠাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল মোল্লা বখতিয়ার। নিকোলাইয়ের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে ডকুমেন্টটা কেড়ে নিল সে, মুঠো পাকানো অপর হাত দিয়ে ঘুসি চালাল তার নাক বরাবর। কিন্তু বয়স হয়েছে বুড়োর। হাত তুলে আঘাতটা সহজেই ঠেকিয়ে দিল নিকোলাই, তারপর বুড়োর শার্টের সামনেটা মুচড়ে ধরে ঠাস করে একটা চড় কষল।

চিৎকার দিয়ে ছুটে এল আইরিন, দশ আঙুলের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে নিকোলাইকে। তবে এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিল লম্বা-চওড়া লোকটা। ভারসাম্য হারিয়ে ডেকের উপর পড়ে গেল আইরিন।

বুড়ো বখতিয়ারকে আবার চড় মারতে যাচ্ছে নিকোলাই, কাঁধ ধরে তাকে নিজের দিকে ফেরাল রানা। 'একজন বুড়ো মানুষকে মারছ কেন?' বলল ও। 'বরং আমাদের বয়স মেলে।'

নাক-মুখ কুঁচকে ঘুসি চালাল নিকোলাই, মাথাটা একপাশে সরিয়ে আঘাতটা এড়াল রানা, তারপর হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড কোপ মারল লোকটার নাকের ব্রিজে। হোঁচট খেতে খেতে দু'তিন পা পিছু হটল সে, নাক চেপে ধরা হাতের আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরুচ্ছে। সামনে এগিয়ে আরও দুবার মারল তাকে রানা।

শেষ ঘুসিটা রেইলিঙ টপকে ভারি শরীরটাকে ওপারে পাঠিয়ে দিল, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল সে।

চারদিকে পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল নিকোলাই। দশ সেকেন্ড পর স্পিডবোটের পাশে ভেসে উঠল।

ঝুঁকে তার কলার ধরল অ্যাডোনিস, টেনে-হিঁচড়ে বোটের পিছনে তোলার চেষ্টা করছে। মই বেয়ে নেমে এল রানা, লাফ দিয়ে স্পিডবোটে চড়ে সাহায্য করল অ্যাডোনিসকে।

হাত-পা ছড়িয়ে রিয়ার সিটে পড়ে আছে নিকোলাই, ভিজে কাপড় সেঁটে আছে চর্বি থলথলে গায়ে, নাকের ফুটো ও ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের ক্ষীণ ধারা গড়াচ্ছে। মানিব্যাগ বের করে বারোটা একশো ডলারের নোট আলাদা করল রানা, তারপর গুঁজে দিল গ্রিক মহাজনের বুকপকেটে।

'তোমার পাওনা তুমি পেয়ে গেছ, নিকোলাই,' বলল রানা। 'মোল্লাকে আবার যদি বিরক্ত করো, আমি তোমার ঘাড় মটকাব।' অ্যাডোনিসের দিকে ফিরল ও। 'তুমি সাক্ষী থাকলে।'

মই বেয়ে ভাড়া করা লঞ্চে উঠে যাচ্ছে রানা। স্টার্ট দিয়ে স্পিডবোট ছেড়ে দিল অ্যাডোনিস, বড় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ফিরে যাচ্ছে। যতক্ষণ রিফের আড়ালে অদৃশ্য না হলো, সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ইঞ্জিন চালু করবার জন্য ইঙ্গিত করল সারেংকে।

তামান্নার হুইলহাউসের বাইরে একটা বেঞ্চে রানার দিকে চেয়ে বসে আছে মোল্লা বখতিয়ার, ধীরে-সুস্থে আনমনে তামাক ভরছে পাইপে। কাজটা শেষ করবার পর পাইপে আগুন ধরাল, এক মুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে এক কি দু'বার খুক খুক করে কাশল। তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে। মনে হলো কিছু বলতে চায়।

ফিরে এল রানা বুড়োর বোটে।

'তা হলে আবুযারে যাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল মোল্লা বখতিয়ার। 'আপনার হাতে আমার প্রাণ বাঁচল। অপমানের হাত থেকে বাঁচলাম। আমার বোটটাও রক্ষা পেল। এ স্রেফ নিয়তি।'

'এজন্যে আপনার কৃতজ্ঞ বোধ করার প্রয়োজন নেই,' বলল রানা। 'যা করেছি, আমি আমার ছোট বোনটার জন্যে করেছি। আরেকটা বোট আমি জোগাড় করে নেব হার্মোনি থেকে।'

'তুই কী বলিস?' আইরিনের দিকে ফিরল বৃদ্ধ।

উল্টোদিকের রেইলিঙে শিরদাঁড়া ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি, তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের নখের দিকে। চোখ তুলল সে, গম্ভীর হয়ে আছে কচি মুখটা। তারপর ছোট্ট করে একটু মাথা ঝাঁকাল। মুখে বলল, 'যাব আমরা।'

'না গেলেও কিন্তু পারেন,' বলল রানা। 'ওখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

'তবু।' মেয়েটি অবিচল।

'এই যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে আর দেরি করব না,' বলল রানা। 'এখুনি রওনা হতে পারলে ভাল হয়।'

ফুয়েলের অবস্থা দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ, চালু করল ইঞ্জিন। লঞ্চের সারেংকে বকশিশ দিয়ে হার্মোনিতে ফিরে যেতে বলল রানা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি রানা, সজাগ হওয়ার পর হাতঘড়ি দেখে বুঝল রাত তিনটে। ভারি জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

সাগর থেকে হালকা কুয়াশা উঠছে। চাঁদ নেই, তবে আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, মায়াবি ও শুভ্র একটা আভা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সাবলীল ভঙ্গিতে দ্রুত ছুটে চলেছে ওদের মোটর ক্রুযার তামান্না।

এদিক ওদিক সামান্য কাত হচ্ছে বোট, রেলিং ধরে সাবধানে এগোল রানা। তিনটে টিউনা মাছকে টপকাতে হলো। সন্ধের আগেই এগুলো ধরেছে ও ছিপ দিয়ে। বিক্রি হবে আবুযারে। টলমলো পায়ে হুইলহাউসে গিয়ে ঢুকল ও।

হুইলে রয়েছে মোল্লা বখতিয়ার, কমপাসের আলো মাথায় না পড়ায় মুণ্ডুবিহীন একটা কায়া বলে মনে হচ্ছে তাকে। 'সব ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'স-ব ভাল, বাপ।' একপাশে সরে গিয়ে রানাকে হুইল ধরবার সুযোগ করে দিল বুড়ো, দরজায় গায়ে হেলান দিয়ে পাইপে তামাক ভরছে।

'আবুযারে কখন পৌঁছাব আমরা?'

শ্রাগ করল বখতিয়ার। 'আবহাওয়া ভাল থাকলে কাল দুপুর নাগাদ।'

'কোনও বিধি-নিষেধ আছে? মানে, কতক্ষণ থাকতে পারব না পারব?'

'আগে তো ছিল না। এখন কী অবস্থা কে জানে।'

'মাছগুলো সঙ্গে সঙ্গে বেচতে পারবেন?'

'তা পারব।' পাইপে আগুন ধরাবার সময় আড়চোখে রানার দিকে তাকাল বখতিয়ার। 'আপনার মাছের কপালটা ভাল।' একটু থেমে আবার বলল, 'তা ছাড়া, আরেকটা কথা না বললে অন্যায় হবে: নাবিক হিসেবেও আপনি দারুণ।' হেসে উঠল বুড়ো। 'এ-সব দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে আপনি আসলে একজন ফটোগ্রাফার।'

'সাগরের কিনারায় মানুষ হয়েছি,' মিথ্যে বলতে হলো রানাকে। 'একটা সময় ছিল সারাটা দিন বোটেই কাটত।'

'ও।' আরেকবার চোরা চোখে রানাকে দেখে নিয়ে সিধে হলো বখতিয়ার। 'দেখি ঘুম আসে কি না। সাতটার দিকে হুইল নেব।' একটা গ্রিক গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল বুড়ো।

দেয়াল থেকে একটা কবজা লাগানো চেয়ার নামিয়ে বসল রানা। সাগরের দিকে তাকিয়ে এটা-সেটা ভাবছে।

হঠাৎ রানার সংবিৎ ফিরল দরজা খোলার আওয়াজে। পরমুহূর্তে শুরু হলো আকস্মিক বৃষ্টি, জানালার কাঁচে শব্দ করছে ফোঁটাগুলো। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। কফির গন্ধ পেল ও। তার সঙ্গে হুইলহাউসে আরও একটা গন্ধ ঢুকে পড়েছে। ওর খুব চেনা একটা সুবাস। চুল, সুগন্ধি তেল, নিঃশ্বাস, সেন্ট, গায়ের ঘাম ইত্যাদি মিলে তৈরি। নারীর গন্ধ।

'বিছানা কী দোষ করল?' জানতে চাইল রানা।

'রাতের সবচেয়ে শান্ত আর মিষ্টি সময় এটা,' বলে একটা চেয়ার নামিয়ে রানার পাশে বসল আইরিন, তারপর ডেক থেকে ট্রেটা তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। শুধু কফি নয়, স্যান্ডউইচও এনেছে।

খাওয়া শেষ হতে গল্প করছে দুজন।

'আপনি সাগর খুব ভালবাসেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল আইরিন।

সাবধানে জবাব দিল রানা। 'তা বাসি।'

'আপনার মত অদ্ভুত ফটোগ্রাফার জীবনে দেখিনি আমি।'

বাপের মতই, মেয়ের কথার মধ্যেও, অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন রয়েছে। রানা জানে, পরিস্থিতিটা নাজুক। বলল, 'মায়ামি বিচের একটা স্যালভেয কোম্পানিতে বেশ কয়েক বছর চাকরি করেছি। আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফার হিসেবে।'

'ও, আচ্ছা। তা হলে আর আপনাকে অদ্ভুত বলার কোনও সুযোগ নেই।' হেসে উঠল আইরিন। তারপর জানতে চাইল, 'আবুযারে আপনার এই ট্রিপ, খুব গুরুত্বপূর্ণ কি?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'বলেছেন, বিপজ্জনক। কী ধরনের বিপদ?'

'আমার প্রতি মস্ত অন্যায় করা হয়েছে, আমি প্রতিশোধ নিতে

চলেছি। বিপদ-বাধা তো আসতেই পারে।'

'কী অন্যায়?'

'একটা মেয়েকে ভালবাসতাম। ওরা মেরে ফেলেছে তাকে।'

'একা?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আইরিন। 'তা হলে তো,' আন্তরিক সুরে বলল মেয়েটি, 'ভাল একটা কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারছি আমরা।'

বাপ ও মেয়ে, দুজনেই অত্যন্ত সরল। মিথ্যেকথা বলতে না হওয়ায় খুশি রানা। কিন্তু ওদের কোনও বিপদ হোক তা ও চায় না। বলল, 'তবে খুব বেশি সাহায্য করতে যেয়ো না। ওখানে সামান্যতম বিপদ দেখলেই তোমার আব্বুকে বোট নিয়ে হার্মোনিতে ফিরে যেতে বলবে।'

'আপনাকে ছাড়াই?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজনে আমাকে ছাড়াই।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কথাগুলো নিয়ে ভাবল মেয়েটি। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই যে তখন বললেন : যা করেছি, আমি আমার ছোট বোনটার জন্যে করেছি – খুব ভাল লাগল।'

প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করল রানা। 'নিকোলাইয়ের বন্ধু ইবনে শাইখটা কে? তোমাকে যে বিয়ে করতে চায়?'

'একটা পশু। বয়স আশির কাছাকাছি, তিন নম্বর স্ত্রীর বয়স আঠারো। ধর্মে আছে, তাই মারা যাবার আগে তাড়াতাড়ি আরও একটা করতে চায় –আমাকে।'

'ছি।'

'হ্যাঁ, ছি। অন্যান্য ধর্মের লোকজনের কাছে এই ব্যাপারটার জন্যে ছোট হচ্ছি আমরা। বয়স যতই হোক, টাকা থাকলে একের পর এক বিয়ে করতে পারবে পুরুষ।'

'মাইলস্ বলছিল তুমি আমেরিকায় পড়ছ।'

'পড়তাম। ছুটিতে আসার পর আর যাইনি।'

'কী পড়ছিলে ওখানে?'

‘পড়ছিলাম মানে... বছর দুয়েক আগে নিউ ইয়র্কের একটা আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম,’ বলল আইরিন। ‘আইডিয়াটা আব্বুর। দাদু মারা যাওয়ায় কিছু টাকা পেয়েছিল, খেয়াল চাপল মেয়েকে নামকরা শিল্পী বানাবে। কিন্তু ভেবে দেখেনি ওই কটা টাকায় কদিন চলবে।’

‘ছুটিতে ফিরে আব্বুর অবস্থা দেখে আর যাওয়া হয়নি?’

‘কী করে যাই, বলুন! লেখাপড়া আগে, না কি বুড়ো বাপকে বাঁচানোটা আগে?’

‘হুম।’

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হলো না। এক সময় বৃষ্টি ছেড়ে গেল। শান্ত নীরবতার মধ্যে ভোর হলো। আরও একটু গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সাদাটে কুয়াশা। তবে বড় কোনও ঢেউ নেই সাগরে।

চেয়ারে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আইরিন। ভোরের আলোয় আশ্চর্য স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় একটা রূপ ধরা পড়ল মেয়েটির চেহারায়। রানা বিস্মিত, তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না। মনে হলো সত্যিকার অর্থে মেয়েটিকে এর আগে দেখেনি ও।

চোখ খুলে ওর দিকে তাকাল আইরিন। মৃদু হাসি ফুটল মুখে। ‘গুড মর্নিং, ভাইয়া।’ দাঁড়াল সে, চেয়ারটা তুলে রাখল দেয়ালে।

হাসল রানাও। ‘গুড মর্নিং।’

‘আমি যাই, ব্রেকফাস্ট রেডি করি।’ ট্রে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে আইরিন, দরজার কাছে পৌঁছে ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে। ‘আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আর হবে কি না জানি না।’

অপেক্ষা করছে রানা। ভাবছে, কী বলবে কে জানে!

‘আবুযারে যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়েছেন। সেজন্যে আপনার প্রতি আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।’

ঘুরে চলে গেল আইরিন। তার পায়ের আওয়াজ ডেক ধরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

# দশ

দুপুরের প্রচণ্ড রোদে সেদ্ধ হচ্ছে আবুযার। বাঁক ঘুরে হেডল্যান্ডকে পাশ কাটাবার সময় পিল বক্সটাকেও পিছনে ফেলে এল ওরা, ঢুকে পড়ল সরু চ্যানেলে। অপরদিকে, দূরে, পানি থেকে একশো ফুট উপরে উঠে গেছে পাহাড়-প্রাচীর, মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন দুর্গটা।

হুইলহাউসের জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোল্লা বখতিয়ার, দুর্গটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ইজরায়েলিরা ওটাকে এখন কারাগার হিসেবে ব্যবহার করছে। ওখানে বন্দিদের ওপর যে ধরনের টরচার করা হয়, শুনলেও গা শিউরে ওঠে।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রানা। কমকরেও চারশো বছরের পুরানো কাঠামো। তবে মেরামতের সময় অন্তত বাইরের দিকটায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আবুযার ছোট একটা সাধারণ ফিশিং পোর্ট। হারবারে অল্প কয়েকটা বোট দেখা যাচ্ছে। ম্লান, নিস্তেজ একটা পরিবেশ। এমনকী টাউন হলে তোলা ইজরায়েলি পতাকাটাও কড়া রোদের মধ্যে নোংরা ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে আছে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল বখতিয়ার, ইঙ্গিতে রানাকে ছেড়ে দিতে বলল নোঙরটা। খানিক পর ভাঙাচোরা কংক্রিট জেটির কাছ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে থামল তামান্না। হারবারের এটা দক্ষিণ দিক।

হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে রানার পাশে, রেইলিঙে এসে দাঁড়াল বখতিয়ার। 'হারবার মাস্টার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত এখানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল আইরিন। জিনস ও টি-শার্টে ভাল লাগছে তাকে। মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়েছে। চোখে সান গ্লাস। রানার আরেক পাশে এসে দাঁড়াল সে।

'কেমন ভয় ভয় করছে। না গেলে হয় না?' জানতে চাইল আইরিন।

'আমি একটা কাজে এসেছি, অন্তত চেষ্টা করে দেখব সেটা শেষ করতে পারি কি না। কোনও ভয় নেই, আশা করি সব ঠিকঠাক মত চলবে।' ওদের চোখ এড়িয়ে শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাঁটটা একবার স্পর্শ করল রানা।

হারবারে মাছ ধরছে দুটো নৌকা, সেগুলোর মাঝখান দিয়ে ছোট একটা রোয়িং বোট ছুটে আসছে ওদের দিকে। বৈঠায় রয়েছে এক লোক, তাকে তাগাদা দিচ্ছে খাকি ইউনিফর্ম পরা মোটাসোটা একজন অফিসার। লোকটার গালে কালো দাড়ি।

লোকটাকে দেখে শব্দ করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল

বখতিয়ার। 'আল্লাহকে ধন্যবাদ, সেই আগের হারবার মাস্টারই,' বলল সে। 'এজরা আহুদ। মানুষটা ভাল।'

'শুরুটা অন্তত ভাল হোক,' বলল রানা।

তামান্নার গায়ে ঘষা খেল রোয়িং বোট। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে আহুদ, ঘামে চকচক করছে তার মুখ। আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলল সে। 'আরে, আমার পুরানো ভাই মোল্লা বখতিয়ার যে! অনেকদিন পর একটা পুরনো মানুষ দেখলাম। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। কত দিন এদিকে আসনি বলো তো!'

রেইলের উপর দিয়ে ঝুঁকে আহুদের হাত ধরল মোল্লা বখতিয়ার। 'ভাই আহুদ, আবার দেখা হওয়ায় কী ভাল যে লাগছে। সব ঠিকঠাক তো?' ইঙ্গিতে আইরিনকে দেখাল। 'আমার মেয়ে। ওর কথা অনেকবার বলেছি তোমাকে।'

আন্তরিক খুশিতে হেসে উঠল এজরা আহুদের চোখ দুটো। 'তোমার নাম আইরিন, তুমি নিউ ইয়র্কে পড়ো,' বলল সে। 'দেখলে তো, তোমার সম্পর্কে কত কিছু জানি আমি!' আবার বখতিয়ারের দিকে তাকাল। 'তোমার ছেলে ইমতিয়াজ কেমন আছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বখতিয়ার। 'ভাই রে,' শান্তভাবে বলল সে, 'ছেলেটা আমার গত বছর এক ঝড়ের মধ্যে পানিতে ডুবে মারা গেছে।'

শোকে কাতর দেখাল আহুদকে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল সে। 'তার আত্মা শান্তিতে থাকুক।' তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল ভাল করে। 'ইনি কে?'

'রডরিক পেরেরা, ফটো-জার্নালিস্ট। তোমাদের দ্বীপে আসতে চায়, কিন্তু কে তাকে সাহস করে নিয়ে আসবে? শেষ পর্যন্ত এক শর্তে রাজি হলাম আমি –আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে হবে।'

হেসে ফেলল হারবার মাস্টার। 'ভাল করেছ।'

‘তুমি বোটে আসছ?’ জিজ্ঞেস করল বখতিয়ার।

মাথা নাড়ল ইহুদি হারবার মাস্টার। ‘সোজা জেটিতে চলে যাও, ওখানে কথা হবে।’

‘জাহিদি কি এখনও তার হোটেলটা চালাচ্ছে?’

মাথা ঝাঁকাল এজরা আহুদ। ‘ব্যবসার অবস্থা আগের মত ভাল নয়, বিশেষ করে মুসলমানদের, তারপরও কোনওরকমে টিকে আছে জাহিদি।’

‘ঠিক আছে, জেটিতে দেখা হবে।’

হারবার মাস্টারকে নিয়ে রোয়িং বোট চলে যাওয়ার পর রানার দিকে ফিরে হাসল বখতিয়ার। ‘বোধহয় কোনও সমস্যা হবে না।’

‘আমারও তাই মনে হচ্ছে,’ বলল রানা। ‘জাহিদি কে?’

‘ইজরায়েলিদের অত্যাচার সহ্য করে এখানে এখনও যে-সব মুসলমান রয়ে গেছে, জাহিদি তাদের একজন।’ ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার জন্য হুইলহাউসে ঢুকল সে।

উইঞ্চ ঘুরিয়ে নোঙর তুলে নিল রানা। হুইলহাউসে ঢুকে বলল, ‘ওখানে আপনাদের না নামাই উচিত বলে মনে হচ্ছে। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলে যান আপনারা।’

‘তারপর?’ ভুরু নাচাল আইরিন। ‘ফিরবেন কী করে?’

‘একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই,’ বলল রানা। আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে যাচ্ছে দেখে ঘাড় কাত করে তাকাল ও বৃদ্ধের দিকে। ‘আমি কিন্তু আমাকে শুধু পৌঁছে দিতে বলেছি। তার বেশি কিছু নয়।’

‘এখন আর তা হয় না, বাপ,’ বলল মোল্লা বখতিয়ার। ‘আহুদ কিছু না খাইয়ে সহজে ছাড়বে না আমাকে।’

‘আমি আইরিনের বিপদের কথা ভাবছি।’

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল বৃদ্ধ।

জেটিতে ভিড়ে ওরা দেখল হারবার মাস্টার আগেই

পৌঁছেছে। মই বেয়ে উঠল রানা, হাত ধরে উঠতে সাহায্য করল আইরিনকে।

'তোমার টিউনার যে সাইজ, বিক্রি হতে সময় লাগবে না,' বখতিয়ারকে বলল হারবার মাস্টার। ওদের সবাইকে নিয়ে জেটি থেকে নেমে এল সে, সৈকত ধরে হাঁটছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল বাখতিয়ার।

'মেহমানদারির এই সুযোগ আমি তো ছাড়তে পারি না,' বলে হাসল আহুদ। 'চলো, জাহিদির ওখানে গিয়েই বসি।'

জাহিদির হোটেলের সাইনবোর্ডে শুধু হোটেল শব্দটা লেখা আছে। 'নতুন আইন হয়েছে, মুসলমানরা সাইনবোর্ডে নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারবে না,' ব্যাখ্যা করল আহুদ।

বাইরের ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা কাঠের টেবিল ফেলা হয়েছে, তবে কোনও কাস্টোমার নেই। রানা ধারণা করল, সন্ধের দিকে লোকজন আসে।

ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হলেও, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টেবিলের সংখ্যা এখানে আরও বেশি, তবে সবই খালি। ক্যাশ কাউন্টারে বসে এক লোক খবরের কাগজ পড়ছে, তার মুখের ডান দিকটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, ওদিকের চোখটায় কালো পট্টি বাঁধা।

'হ্যালো, জাহিদি, দেখো কে এসেছে!' বলল আহুদ।

অবাক হয়ে মুখ তুলল জাহিদি। মোল্লা বখতিয়ারকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। হাতের কাগজ রেখে কাউন্টারের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। 'মোল্লা বখতিয়ার!' কোলাকুলি করছে দুই বুড়ো। 'সাহস করে তা হলে আসতে পারলে!'

জাহিদির কাঁধে একটা হাত রাখল বখতিয়ার। 'তোমার মুখ, জাহিদি। কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হোটেল মালিক, হাসিটা ম্লান হলো একটু। 'কিছু

না, দোস্ত। মাস তিনেক আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করি আমি।' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'তুমি মাছ এনেছ তো?'

বখতিয়ার মাথা ঝাঁকাল। 'গোটা তিনেক টিউনা।'

একটা চেয়ার টেনে আইরিনকে বসতে ইঙ্গিত করল হারবার মাস্টার। 'কথাবার্তা পরে হবে, জাহিদি। আগে ওদের জন্যে গলদা চিংড়ির কাটলেট আর কফির ব্যবস্থা করো। আর আমাদের দুজনের জন্যে সবচেয়ে ভাল একটা বোতল বের করো,' কথা শেষ করে ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল। 'ফটো-জার্নালিস্ট, রডরিক পেরেরা।'

'এই আস্তে!' ফিসফিস করল জাহিদি। 'তুমি আমার ইজ্জত মারতে চাও নাকি?'

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এতই করুণ যে হোটেল বসে ভাল-মন্দ কিছু কিনে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না তারা। তাই ইহুদি ও খ্রিশ্চান খদ্দের ধরবার জন্য বাধ্য হয়ে মদ বেচছে জাহিদি।

'ভাল কিছু আছে তো?' নিচু গলায় জানতে চাইল আহুদ।

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল জাহিদি। 'কর্নেল ইয়েলিচ-এর জন্যে এক বোতল টিচার রেখেছি। তবে সন্ধের আগে তিনি আসবেন না।' দ্রুত পায়ে পিছনের একটা কামরায় চলে গেল সে।

এজরা আহুদের দিকে ফিরল রানা। 'কর্নেল ইয়েলিচ কে? নামটা রাশিয়ান মনে হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে হারবার মাস্টারের চেহারায় ভয় ও উদ্বেগের ছায়া পড়ল। 'দুর্গের কমান্ডার তিনি, মোসাদ কর্মকর্তা। হ্যাঁ, নামটার মধ্যে রুশ রুশ গন্ধ আছে – কর্নেল আইজ্যাক ইয়েলিচ। কারণ হলো, তিনি রাশিয়ান ইহুদি, ইজরায়েলে সেটেলড্।'

পাইপে তামাক ভরছে বখতিয়ার। 'জাহিদির মুখের অবস্থা অমন হলো কী করে?' জানতে চাইল সে।

'মাস তিনেক আগে মেইনল্যান্ড থেকে একদল ফিলিস্তিনি

বন্দিকে দুর্গে আনা হয়,’ বলল হারবার মাস্টার। ‘অত্যন্ত বদ আর হিংস্র ছিল তাদের গার্ডরা। একদিন মদ খেয়ে হোটেলটা ভাঙচুর শুরু করে দিল তারা। জাহিদি থামাতে চেষ্টা করছে, এই সময় তাদের একজন ছুরি দিয়ে কিমা বানায় ওর মুখটা। একটা চোখও চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল।’

‘মানুষ নয়, পশু,’ বলল রানা।

ওর দিকে তাকাল এজরা আহুদ। ‘ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা, মিস্টার পেরেরা। কথাটা এমনকী আমার জন্যেও সত্যি, ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর জানতে চাইল, ‘শহরে কি এটাই একমাত্র হোটেল?’

‘আরেকটা ছিল, গতমাসে বন্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের দ্বীপে যত জেলে আছে তারা সবাই মুসলমান, পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে কেউ তারা এখন আর আসে না।’

‘এই হোটেলে এখন কেউ আছে?’

‘আমার মনে হয় গত ছ’মাসে একজন গেস্টও পায়নি জাহিদি।’ হাসল আহুদ। ‘আপনার থাকার কোনও সমস্যা হবে না।’

এই সময় পিছনের কামরা থেকে ফিরে এল জাহিদি। তার এক হাতের উপর পরিষ্কার একটা সাদা কাপড়, আরেক হাতে ট্রে, তাতে হুইস্কির বোতল ও দুটো গ্লাস দেখা যাচ্ছে।

ট্রে নামিয়ে রেখে বোতলটা তুলল জাহিদি। ‘স্বর্গীয় সুধা, তোমরা দুনিয়াতেই খেতে পারছ। আমরাও পাব, তবে বেহেশতে যাবার পর।’

‘ধন্যবাদ, জাহিদি, ধন্যবাদ। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি আসছি।’

ভাষাটা ইংরেজি, তবে উচ্চারণে খানিকটা বিদেশি টান

আছে। দোরগোড়ার পুরোটা দখল করে রেখেছে লোকটার কাঠামো। পানামা হ্যাট ছায়া ফেলেছে তার মুখে। কড়া ভাঁজ করা লিনেন-এর সুট টান টান হয়ে আছে কাঁধের কাছে।

কামরার ভিতর ঢুকল লোকটা, হাতের মালাকা ছড়িটা সরাসরি তাক করল জাহিদির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে গেল জাহিদির চোখ-মুখ, হাত থেকে বোতলটা ছেড়ে দিল সে। খপ করে সেটা ধরে ফেলল রানা, সাবধানে রেখে দিল টেবিলের মাঝখানে।

অশুভ কিছু আঁচ করতে পেরে স্থির হয়ে গেছে মোল্লা বখতিয়ার।

আর সবার অগোচরে চেয়ার ছেড়ে রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আইরিন, প্রায় লুকিয়ে আছে।

'ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, মিস্টার,' মাংসের পাহাড়টা বলল। 'এক বোতল টিচার নষ্ট করা রীতিমত ক্রাইম। কিন্তু, জাহিদি, গ্লাস মাত্র দুটো দেখতে পাচ্ছি যে?'

নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটল জাহিদি। হঠাৎ লাফ দিয়ে হারবার মাস্টার আহ্‌দ যেন প্রমাণ করতে চাইল পাথরের মূর্তি নয় সে। একটা চেয়ার টেনে এনে বলল, 'বসুন, সার।'

'ধন্যবাদ, হারবার মাস্টার, ধন্যবাদ।' ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠার মত একবার উফ্ করে উঠে চেয়ারটায় বসল আগন্তুক। 'ইংরেজিতে একটা কথা আছে। দুপুরের রোদে শুধু পাগলা কুত্তারা বেরোয়। আমি মনে করি কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে। আপনারা আমার সঙ্গে একমত?'

'এই নিন পাগলামি দূর করার দাওয়াই।' একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে সামনে ঠেলে দিল রানা।

'ধন্যবাদ জানাই, মিস্টার, ধন্যবাদ। তবে সবাইকে ফেলে একা ড্রিঙ্ক করাটাকে গুড ম্যানার বলা যায় না। হারবার মাস্টার আহ্‌দ, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

'জী, হ্যাঁ, অবশ্যই, কর্নেল ইয়েলিচ।'

আচ্ছা, ভাবল রানা, এই লোকটাই তা হলে কর্নেল আইজ্যাক ইয়েলিচ। অকস্মাৎ এভাবে তার উদয় হওয়াটা কি কাকতালীয় হতে পারে? মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর।

হড়বড় করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে হারবার মাস্টার। কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, নিজের পরিচয়ও দিল। কপালের কাছে হাত তুলে সালাম করল মোল্লা বখতিয়ার। আইরিনও তাই করল।

এই সময় আরও একটা গ্লাস নিয়ে ফিরে এল জাহিদি। ট্রে হাতে তার পিছু নিয়ে এল একজন ওয়েটার, তাতে কাটলেট ও ধূমায়িত কফির কাপ দেখা যাচ্ছে। টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল ওয়েটার, কিন্তু কেউ সেদিকে হাত বাড়াল না। সবার মধ্যে কী হয় কী হয় ভাব।

রানা অর্থাৎ পেরেরা ও আহুদের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল কর্নেল ইয়েলিচ। জ্যাকেটে তার ঘামের দাগ ফুটতে যাচ্ছে – মুখ, গলা, ঘাড় ও চিবুকের চর্বিসর্বস্ব ভাঁজ থেকে খুদে নদীর মত ঘামের ধারা বেরুচ্ছে। লাল সিল্ক রুমাল বের করে যতটা পারা যায় মুছল, তারপর পানামাটা হাতে নিল। সম্পূর্ণ ন্যাড়া একটা মাথা।

তার কঠিন ও ঠাণ্ডা চোখ দুটো একটুও নড়াচড়া করছে না, দয়ামায়ার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। 'বেচারি জাহিদি! তোমাদেরকে আমি চমকে দিয়েছি, কি বলো? আত্মা খাঁচাছাড়ার অবস্থা, হ্যাঁ?' জাহিদির কপালের পাশের একটা শিরা কেঁপে উঠল। সেটা লক্ষ করে হাসতে শুরু করল কর্নেল ইয়েলিচ, হাসির দমকে জেলির মত কাঁপছে তার বিশাল ভুঁড়ি। 'গ্রীষ্মের সেই অ্যাক্সিডেন্টটার পর তুমি আর স্বাভাবিক হতে পার না।'

সামনের দিকে ঝুঁকল আইরিন, কী না-জানি বলে ফেলে ভেবে তাড়াতাড়ি তার বাহুতে মৃদু চাপড় দিল রানা, তারপর বোতলটা ধরে বলল, 'আরেকটু হুইস্কি, কর্নেল?'

রানার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে বড় একটা চুমুক দিয়ে ঢেকুর তুলল কর্নেল। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা হাভানা চুরুট ধরাল। ‘শুনলাম সঙ্গে করে টিউনা এনেছেন, ক্যাপটেন?’

মোল্লা বখতিয়ার মাথা ঝাঁকাল। ‘টিউনা এনেছি উপরি লাভের আশায়, সার,’ বলল সে। ‘এখানে আসার আসল কারণ হলো, মিস্টার রডরিক পেরেরাকে পৌঁছে দেয়া, সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আগের মত আচরণ করা হয় কি না দেখা।’

‘নিরীহ মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই,’ বলল কর্নেল ইয়েলিচ। ‘কড়াকড়ি করা হচ্ছে হিযবুল্লাহ ও হামাসের কেউ যাতে দ্বীপে পা ফেলতে না পারে।’ রানার দিকে ফিরল সে। ‘তা হলে আপনি একজন ফটো-জার্নালিস্ট, হ্যাঁ? দুর্গটার কোথায় কী আছে জানতে এসেছেন? তথ্যগুলো চড়া দামে বিক্রি করবেন?’

শুকনো একটা ফোঁপানোর মত আওয়াজ বেরুল মোল্লা বখতিয়ারের গলা থেকে।

শার্টের ভিতর ঢুকতে শুরু করল রানার হাত।

দেখতে পেয়ে মাথা নাড়ল কর্নেল ইয়েলিচ। ‘কাজটা আপনার ঠিক হচ্ছে না, মাসুদ রানা।’

‘কী বললেন?’

শক্ত ও ঠাণ্ডা কী যেন একটা খোঁচা মারল পিঠে, ঘাড় ফেরাতে একটা সাব-মেশিনগানের নল দেখতে পেল রানা। ওটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার সতর্ক ও দৃঢ় হাবভাবই বলে দিচ্ছে পেশাদার সৈনিক সে। কড়া ইস্ত্রি করা খাকি ইউনিফর্ম পরে আছে, বেরেটটা কালো, তার সঙ্গে ম্যাচ করা দাড়ি।

হাত দুটো মাথার উপর তুলতে বলা হলো রানাকে। পাশে সরে এল সৈনিক, ওর জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তলটা।

নিজের গ্লাসে আরও একটু হুইস্কি ঢালল এবার কর্নেল। চুমুক দিচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। 'সত্যি কথা বলতে কি, টিচার আমার প্রিয় হুইস্কি। না চাইতেই হপ্তায় দুটো করে বোতল দিচ্ছে জাহিদি। না জানি চাইলে আরও কত কী দেবে।'

'নিচ্ছেন, শোধ করতে হবে না?' জানতে চাইল রানা।

মুহূর্তের জন্য দৈত্যটার চোখে কী যেন একটা জ্বলে উঠল, সামলেও নিল চট করে। তারপর আচমকা হাসতে শুরু করল, পিছনদিকে খানিকটা হেলে পড়ল মাথা, শরীরের মাংস ও চর্বি নাচানাচি করছে। এক সময় যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল, দেখা গেল চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে।

'মাই ডিয়ার মাসুদ রানা,' বলল আইজ্যাক ইয়েলিচ, সিল্কের রুমাল বের করে চোখ মুছল। 'সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গ দারুণ উপভোগ করব আমি।'

'মাসুদ রানা?' ফিসফিস করল আইরিন, বিস্ময়ে বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে।

## এগারো

শুকনো নালা থেকে জিপটা উঠে আসতে এই প্রথম দুর্গটার পুরো চেহারা ভাল করে দেখতে পেল রানা। পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে চওড়া শেলফ বা তাক-এর মত বেরিয়ে আছে ছোট মালভূমিটা, সেটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ওই কেল্লা। ওটার পিছনে গভীর খাদ, একশো ফুট নীচে সাগর।

রানাকে বসানো হয়েছে পিছনের সিটে, দু'পাশে দুজন সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। কর্নেল সামনের দিকে, ড্রাইভারের পাশে বসেছে।

মোল্লা বখতিয়ার ও আইরিনকে পিছনের একটা জিপে করে আনা হচ্ছে।

প্রাচীন দুর্গপ্রাকারের গায়ে বড় বড় ফাঁক দেখা যাচ্ছে, এক সময় ওখানে কামান ছিল।

দুর্গের খোলা গেটের সামনে থামল জিপ। গাড়িতে কারা আসছে দেখেই একজন সেন্ট্রি আড়াআড়িভাবে ফেলা পোলটা উঁচু করল। আবার এগোল জিপ। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল কর্নেল ইয়েলিচ, হাসছে। 'দেখার মত একটা দুর্গ, তাই না, মিস্টার রানা?'

প্রকাণ্ড খিলান ও টাওয়ারটার দিকে তাকাল রানা। 'গেটের মাথার ওই শিকগুলোয় দু'একটা নরমুণ্ডু গেঁথে রাখলে বোধহয় আরও মানানসই হতো।'

'ওসব প্রাচীন রীতি। ওখানে আপনি বিশেষ কারও মাথা দেখতে চান?'

'জিমি মোরেলকে দিয়ে শুরু করা যায়।'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল আইজ্যাক ইয়েলিচ। 'আপনার এই একটা জিনিস আমার ভারি পছন্দ। দ্বিধা না করে সরাসরি আসল কথায় চলে আসা।'

'মাথা ঘামানোর বিশেষ দরকার হয়নি,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। 'আর কেউ হতে পারে না।'

'যুক্তিযুক্ত উপসংহার। বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ।'

একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল জিপ, ঝাঁকি খেয়ে থামল খিলানসহ একটা দরজার সামনে। সবাই নীচে নামল ওরা। ড্রাইভারকে কর্নেল বলল, 'বুড়ো বখতিয়ার ও তার মেয়ে আইরিনকে নিয়ে

লেফটেন্যান্ট ফাইয়াজ পৌঁছালেই সোজা আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে।'

দরজার ভিতর একপ্রস্থ সিঁড়ি, ধাপ বেয়ে উঠছে কর্নেল। তাকে অনুসরণ করল রানা, ওর ঠিক পিছনেই থাকল গার্ড দুজন। আলোর অভাবে ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে সিঁড়ির ধাপগুলো। এক সময় থামল কর্নেল। তার বাম দিকে একটা দরজা, সম্ভবত গার্ডরুম। সেটা খুলে ভিতরে ঢুকল সে।

দুজন সৈনিক একটা টেবিলে বসে তাস খেলছে। একজন তরুণ সার্জেন্ট সরু কট-এ শুয়ে একটা পর্নো-ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। খেলোয়াড়দের একজন অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের কার্ড। অপরজন হেসে উঠে টেবিলের সমস্ত টাকা টেনে নিল নিজের দিকে। এই সময় কর্নেল ইয়েলিচকে দেখতে পেল তারা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজন, একজনের পায়ের ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল একটা চেয়ার। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল সার্জেন্ট, ব্যস্ত হাতে টিউনিকের বোতাম লাগাচ্ছে। কর্নেলকে স্যালুট করল সে। 'জী, বলুন, কর্নেল?'

'চাবি নাও,' নির্দেশ দিল কর্নেল ইয়েলিচ। 'নীচে নিয়ে চলো আমাদেরকে। ভল্টের লোকটাকে দেখতে চাই আমি।'

'ইয়েস, সার!'

একটা বোর্ড থেকে চাবির গোছাটা নিল তরুণ সার্জেন্ট, তারপর সিঁড়িতে বেরিয়ে এসে সুইচ অন করে ইলেকট্রিক বালবটা জ্বালল সে। লোহার বার লাগানো একটা গেট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তালা খুলল সে।

গেটের ভিতর আরও একপ্রস্থ সিঁড়ির ধাপ, নীচের দিকে নেমে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। আলো জ্বেলে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল সার্জেন্ট।

গম্বুজ আকৃতির সিলিং থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে।

পাথুরে দেয়াল কোথাও শুকনো নয়।

সিঁড়ির নীচে নেমে এসে থামল কর্নেল ইয়েলিচ, ধীরে-সুস্থে একটা চুরুট ধরাল। 'দুর্গের এটা সবচেয়ে পুরনো অংশ। কেমন লাগছে আপনার?'

'আসল কথায় আসুন,' বলল রানা।

'বেশ।' সার্জেন্টের পিছু নিয়ে বলল ইয়েলিচ, 'আবুযারে আসার ব্যাপারে মোল্লা বখতিয়ারকে কী অজুহাত দেখিয়েছেন? কয়েকটা ছবি তুলবেন, তাই না?'

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন কেন আমি এসেছি।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল ইয়েলিচ। 'তা জানি বইকি।'

লোহার একটা গেটের সামনে দাঁড়াল সার্জেন্ট। দ্রুত হাতে তালা খুলল সে। পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে কর্নেলের হাতে ধরিয়ে দিল, তারপর সরে দাঁড়াল একপাশে।

'আপনি পথ দেখান, ডিয়ার ফ্রেন্ড,' বলল কর্নেল।

অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলল রানা। মেঝেতে জমে থাকা পানি ছলকে জুতোর উপর উঠে আসছে। ইয়েলিচ টর্চ জ্বালতেই বড় একটা ইঁদুরকে ছুটে পালাতে দেখল ও।

কামরার আরেক প্রান্ত থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এল। দেয়াল ধরে সেদিকে এগোল টর্চের আলো, স্থির হলো সরু বিছানায় শুয়ে থাকা এক লোকের উপর। তার কাপড়চোপড় অত্যন্ত নোংরা ও ছেঁড়া, শুয়ে আছে নিজের দুর্গন্ধময় ও তরল বর্জ্যের মধ্যে, এত দুর্বল যে মাথা নাড়ার শক্তিও নেই।

'এই লোককেই আপনি খুঁজছেন, মিস্টার রানা,' শান্তকণ্ঠে বলল কর্নেল ইয়েলিচ। 'আহমেদ রব্বানি।'

রব্বানির দিকে তাকিয়ে অসুস্থ বোধ করল রানা। তার শুধু চোখ দুটো নড়ছে। গায়ের চামড়া মড়ার মত সাদা। শুকনো রক্তে লেগে রয়েছে গালে, চিবুকে। চোখ দুটো ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

'রব্বানি, আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?' গ্রিক ভাষায়

জিজ্ঞেস করল কর্নেল ইয়েলিচ। 'মিস্টার রানা তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান।'

খোলা ক্ষতের মত ফাঁক হলো রব্বানির মুখটা, তীব্র ব্যথায় আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল সে।

রানার দিকে ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কর্নেল ইয়েলিচ। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা। আমার সন্দেহ হচ্ছে রব্বানি তার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।'

কথাটা শেষ করে হাসতে শুরু করল ইয়েলিচ। তার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে হাসির গমক, সরু করিডর ধরে ছুটোছুটি করছে। এমনকী গার্ডরাও ভয় পেয়ে গেল, চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

হাস্যরত লোকটার পিছু নিয়ে ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা। হাসি থামিয়ে সার্জেন্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ইয়েলিচ। সেলের দরজায় তালা লাগাল সার্জেন্ট।

গার্ডরুমে ফিরে ওরা দেখল লেফটেন্যান্ট ফাইয়াজ পৌঁছেছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, অপর হাতে সিগারেট।

একটা চেয়ারে বসল কর্নেল ইয়েলিচ, মাথা থেকে পানামাটা নামাল।

জানালার দিকে পিছন ফিরল লেফটেন্যান্ট ফাইয়াজ। 'কর্নেলকে কফি দাও,' বলে একটা আঙুল খাড়া করল সে। সৈনিকদের একজন তাড়াতাড়ি একটা কাপে কফি ঢালল।

'ক্যাপটেন আর তার মেয়ে ওপরতলায়?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আপনার অফিসের বাইরে, সার, ওয়েটিং রুমে।'

'ওদেরকে একটু পরে দেখব আমি,' বলল মোসাদ কর্মকর্তা। 'প্রথমে মিস্টার রানার সঙ্গে কথা সেরে নিতে চাই।'

'আর কোনও নির্দেশ, সার?'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল ইয়েলিচ। 'কেউ উপকার করলে আমরা সব সময় তার প্রতিদান দিই। কিন্তু কেউ যদি একবার আমাদের টিমে নাম লিখিয়ে পরে দলবদল করতে চায়, আমরা অনুমতি দিতে পারি না। ভল্টের ওই লোক, আহমেদ রব্বানির কথা বলছি। তার প্রয়োজন আমাদের কাছে ফুরিয়েছে, কারণ নিশ্চিতভাবে জানা গেছে আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য পাচার করতে যাচ্ছিল সে। সামান্য একটু নির্যাতন করতেই গড়গড় করে বলে দিয়েছে সব।' লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল সে, 'ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করো, ফাইয়াজ। এখানে আমার সঙ্গে শুধু দুজনকে রেখে গেলেই চলবে।'

লেফটেন্যান্ট ফাইয়াজের চেহারায় কোনও ভাবাবেগ ফুটল না। দুই গোড়ালি সশব্দে এক করে স্মার্ট ভঙ্গিতে স্যালিউট করল সে, তারপর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হচ্ছে, ইঙ্গিতে নিজের সামনের চেয়ারটা দেখাল ইয়েলিচ।

বসল রানা।

নতুন একটা চুরুট ধরাল কর্নেল।

রানা বলল, 'প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে চাই আমি। মোল্লা বখতিয়ার আর তাঁর মেয়ের কিছুমাত্র ধারণা নেই আবুযারে কেন এসেছি আমি। ওদেরকে আমি বলেছি, একটা আমেরিকান ম্যাগাজিনের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে, ফটো-ফিচার তৈরি করব। আমার কথা বিশ্বাস করেছে ওরা। আমি যে মুসলমান, তা-ও ওদের জানা নেই।'

'তারপরেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সিরিয়াস ক্রাইম করেছে ওরা।' দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা লেফটেন্যান্টের কাপে ফেলল মোসাদ অফিসার। হিস্ করে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ হলো। 'যাই হোক, তারা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ আপনি।

আমার দু'একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।'

'অযথা সময় নষ্ট করছেন।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসল কর্নেল। 'মনে হয় না। মাসুদ রানা কে বা কী, সবই আমার জানা আছে। আপনি টের পাননি, দু-দিন আগেই আপনার ফটো তোলা হয়েছে, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের। এবং সে-সব ই-মেইলের মাধ্যমে মোসাদ হেডকোয়ার্টার থেকে মন্তব্যসহ পৌঁছে গেছে আমাদের হাতে। ওরা আমাকে নিশ্চিত করেছে আপনিই সেই দুর্ধর্ষ বাঙালি স্পাই, কিংবদন্তির মাসুদ রানা।'

রানা কিছু বলছে না।

'তবে কিছু ব্যাপার আপনার কাছ থেকে জানতে হবে। ওই সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, আদনান মেনদেরেস। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই দু'একজন এজেন্ট ও ইনফরমারের নাম-ঠিকানা দিয়েছে সে, আবুযারে পৌঁছে প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করবেন?'

'জিমি মোরেলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন,' বলল রানা। 'সে হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার কিছু জানা নেই।'

'টেকনিকাল কারণে তার মেসেজটা ছিল সংক্ষিপ্ত। আমি আপনাকে দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করাতে চাইছি।'

শ্রাগ করল রানা। 'আগেই তো বললাম, অযথা সময় নষ্ট করছেন।'

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল রানা, ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একজোড়া কালো চোখ। কুচকুচে কালো ওগুলো, কঠিন ও ঠাণ্ডা। একটা হাত তুলে আঙুল খাড়া করল ইয়েলিচ।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশে দাঁড়ানো সৈনিক দুজন দ্রুত এগিয়ে এল। দু-জন দু-হাত ধরে রানার ঘাড়ের পিছনে টেনে তুলল।

'আমি যে সিরিয়াস লোক, এটা বোঝাবার সময় হয়েছে,'

বলল ইয়েলিচ। চুরুটে লম্বা টান দিল সে, সামনের দিকে ঝুঁকল, তারপর কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ লাল আগুনটা চেপে ধরল রানার জুলফির নীচে।

ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সৈনিকদের একজন ওর চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে রেখেছে।

চুল ও চামড়া পোড়ার গন্ধে ভরে উঠল কামরার বাতাস। বড় করে শ্বাস নিয়ে সহ্য করবার চেষ্টা করছে রানা। হাসিটা বন্ধ করেছে ইয়েলিচ। স্থির চোখে দেখছে রানাকে, ঘামে ভিজে গেছে সারা মুখ।

কিন্তু তারপর যন্ত্রণাটা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে, সেই সঙ্গে টেবিলে পা বাধিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিল পিছনদিকে। সৈনিকদের একজন ভারসাম্য হারাল, ভাঁজ হয়ে মেঝেতে ঠেকল একটা হাঁটু। দ্বিতীয়জন সরে যাওয়ার সময় পেল না, তাকে নিয়ে পিছনদিকে পড়ে গেল চেয়ারটা।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, কষে এক লাথি মারল মেঝেতে পড়া সৈনিকের পেটে, তারপর প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

লাফিয়ে উঠে পিছু নিল মেঝেতে হাঁটু গেড়ে থাকা সৈনিক।

দরজার হাতল ধরেছে রানা, হ্যাঁচকা টান দিতে যাবে, ওর ঘাড়ে মেশিনগানের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল লোকটা।

দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল রানা। মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেছে, অসহ্য ব্যথায় সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। শ্বাস নিতে পারছে না ও, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল ইয়েলিচ হাসছে গলা ছেড়ে।

'ডোসিয়েতে লেখা আছে, ভয়ানক জেদি,' হিব্রু ভাষায় বলল সে। 'তবে সব জেদ ভাঙা হবে। ঠিক যেভাবে হিংস্র কুকুরকে বশ্যতা স্বীকার করানো হয়। ওপরতলায় নিয়ে এসো।'

দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়ায় কপালের ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, চোখে নেমে আসছে লাল ধারাটা। এক হাতে সেটা মুছল রানা। এক সৈনিক হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করাল ওকে। ইঙ্গিতে ইয়েলিচের পিছু নিতে বলল।

পাথুরে ধাপ বেয়ে করিডরে উঠে এল ওরা। শেষ মাথায় দরজার পাশে একজন সেন্ট্রি। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিল সে।

দেয়ালের গা ঘেঁষে ফেলা কাঠের বেঞ্চে বসে রয়েছে মোল্লা বখতিয়ার ও আইরিন। ওদেরকে পাশ কাটাল কর্নেল ইয়েলিচ, কামরার আরেক প্রান্তে থেমে আরেকটা দরজা খুলল, ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল কবাট।

পিঠে মেশিনগান ব্যারেলের গুঁতো খেয়ে কামরার ভিতর ঢুকল রানা। সৈনিক দুজন দরজার দুপাশে পজিশন নিল।

রানার মাথা এখনও ঠিক মত কাজ করছে না। টলতে টলতে দেয়ালের দিকে এগোল ও। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করল দুবার। দাঁড়াল দেয়ালের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে।

'আল্লাহ!' ওকে দেখে আঁতকে উঠল আইরিন।

রানার কপালের ক্ষত থেকে বেরুনো রক্ত সাদা দেয়াল বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে। টলতে টলতে ঘুরল ও, বেঞ্চটায় এসে বসল। ওদের দিকে ফিরে জোর করে হাসল একটু, তবে চোরাচোখে দেখে নিচ্ছে গার্ডদের পজিশন – বুঝতে চাইছে পালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না।

নাহ্, দুজনেই অতি মাত্রায় সতর্ক। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি ওর দিকে অস্ত্র তাক করে।

রাগে কাঁপছে মোল্লা বখতিয়ার। 'ওদের মনে রাখা দরকার আমরা গ্রিসের নাগরিক, আর আপনি একজন বিদেশি ভদ্রলোক। এখানে ওরা আমাদেরকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখতে পারে না। আমরা কোনও ক্রাইম করিনি।'

'এ-সব যুক্তি ওরা কানে তুলবে না,' বলল রানা।

'আমাদেরকে অন্য লাইনে চিন্তা করতে হবে।'

'দেখা যাক কানে তোলে কি না তোলে।'

নিজের রুমালটা ভাঁজ করে প্যাড বানাল আইরিন, নরম হাতে রানার কপালের রক্ত মুছে দিচ্ছে। হাসল রানা। 'ভয় লাগছে?'

'যতটা লাগা উচিত ততটা নয়।'

তার একটা হাত ধরে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল রানা, 'দুঃখিত, আইরিন। নিজের সম্পর্কে সব কথা তোমাদেরকে জানাইনি আমি। আমার জন্যেই আজ তোমাদের এই বিপদ। ছাড়া পাব জানি, কিন্তু কীভাবে, তা জানি না।'

'এতে আপনার কোনও দোষ নেই, বাপ,' বলল মোল্লা বখতিয়ার। 'আপনি আমাদের সাবধান করতে কসুর করেননি। ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছি আমরা।'

রানা কিছু বলতে যাবে, কর্নেল ইয়েলিচের কামরার দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে গ্যাবার্ডিনের সুট পরা ছোটখাট এক ক্লার্ক বেরিয়ে আসছে। ওদের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সে, 'সবাই ভেতরে ঢোকো।' বেঞ্চ ছেড়ে তাকে পাশ কাটাল ওরা তিনজন। ওদের পিছু নিয়ে ঢুকল গার্ডরাও।

কামরার চারদিকের দেয়াল বার্মা টিক-এর প্যানেল দেয়া। ফার্নিচার বলতে কার্পেটের উপর প্লেইন ডেস্ক, কাঠের কয়েকটা চেয়ার।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ইয়েলিচ। ঘুরে ওদের দিকে তাকাল, চোখ-মুখ থমথম করছে। ডেস্কের পিছনে বসল। পেপারওয়েট সরিয়ে কয়েকটা কাগজ নাড়াচাড়া করল। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

'কিছুক্ষণ আগে আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি সহযোগিতা করতে রাজি হননি।'

'আচ্ছামত পিটি দিলে শেষে হয়তো রাজি হতে পারি,' বলল রানা।

কলম তুলে প্যাডে কী যেন লিখল কর্নেল ইয়েলিচ, তারপর কলমটা নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে এবার মোল্লা বখতিয়ারের দিকে তাকাল সে।

'ক্যাপটেন, আপনার কেসটা খুব সাবধানে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। আমার বিশ্বাস এই ভদ্রলোক আপনাদেরকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আপনারা তাঁর অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাই আপনাদের ব্যাপারে আমি কিছুটা নরম হব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের দুজনকে ছেড়ে দেয়া হবে, তবে বাজেয়াপ্ত করা হবে বোটটা।'

নিজের অজান্তেই ঝাঁকি খেল বুড়োর শরীর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, যেন ইয়েলিচের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

দ্রুত সামনে বাড়ল আইরিন। 'এ ভয়ানক অন্যায়! আমরা কোনও অপরাধ করিনি!'

একদিকের ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকা করে কর্কশ সুরে জানতে চাইল ইয়েলিচ, 'বিদেশি একজন স্পাইকে ইজরায়েলের মাটিতে নিয়ে আসা কোনও অপরাধ নয়?'

কথাটা কানে যেতে থেমে গেল আইরিন, যেন অদৃশ্য একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেয়েছে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'সত্যিই?'

কিছু বলার নেই রানার।

বেসুরো গলায় হেসে উঠল কর্নেল ইয়েলিচ। 'তুমি তা হলে ওঁর কথা বিশ্বাস করেছিলে? সত্যি খুব দুঃখজনক।'

'কিন্তু, সার, আপনি আমাদের এত বড় সর্বনাশ করতে পারেন না। ওই বোট আমাদের একমাত্র সম্বল।' তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। রানার দিকে ফিরল, 'আপনি অস্বীকার করুন, ভাইয়া, কর্নেলকে বলুন কথাটা সত্যি নয়।'

'আমি দুঃখিত, আইরিন,' বলল রানা।

কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল ইয়েলিচ। দুজন সৈনিক দ্রুত এগিয়ে

এসে সরিয়ে নিল মোল্লা বখতিয়ার ও আইরিনকে।

'আমি অনুরোধ করছি, কর্নেল, বোটটা ওদেরকে ফিরিয়ে দিন,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা। 'ওরা চলে যাক।'

'কেন ফিরিয়ে দেব?' মাথা নাড়ল ইয়েলিচ। 'বিবেকের দংশন থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্যে? কী দায় ঠেকেছে আমার?'

'এখন তা হলে কী করবে ওরা? বাড়ি ফিরবে কীভাবে?'

'সেটা ওদের সমস্যা।' নোংরা হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'মেয়েটি রূপসী, কোনও একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবে সে।' টেবিলের টেলিফোন বাজছে শুনে রিসিভারটা কানে তুলল, ফিরে আসা সৈনিকদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপাতত বাইরে নিয়ে যাও ওঁকে।'

পাশের কামরায় নিয়ে আসা হলো রানাকে। কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় চিন্তা করছে ও।

ও একা নয়। ওরা তিনজন।

মুশকিল হলো, সৈনিকরা কেউ ওর নাগালের মধ্যে থাকছে না। যে যার সাব-মেশিনগান বাগিয়ে ধরে দূর থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

নাহ্, কোনও সুযোগ নেই।

কামরার এক কোণে বসে কমপিউটারে কী যেন টাইপ করছে ক্লার্ক লোকটা। বেঞ্চে বসে দেয়ালে হেলান দিল রানা, চোখ-কান খোলা রেখে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। শিরদাঁড়ার নীচের দিকটা সরাক্ষণ দপ্ দপ্ করছে।

গার্ডদের একজন সুইচ অন করে আলো জ্বালল। একটু পর দরজা খুলে নিজের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল ইয়েলিচ, হাতে হ্যাট ও ছড়ি। রানাকে দেখে হাসল সে।

'বন্দিকে স্পেশাল সেকশনে নিয়ে যাও। ইরামকে বলো ওঁকে হোল-এ রাখতে হবে। যা করার, কাল আমি নিজে করব।'

'কিন্তু হোলে তো আগে থেকেই এক লোক আছে, কর্নেল,'

অবাক হয়ে বলল ক্লার্ক।

ভ্রূ কোঁচকাল ইয়েলিচ। 'কে সে?'

চট করে একবার রানাকে দেখে নিয়ে গলার আওয়াজ খাদে নামাল ক্লার্ক, কর্নেলের কানের কাছে ফিসফিস করছে।

তার কথা শেষ হতে হেসে উঠল ইয়েলিচ, মাথায় পানামা তুলে কারনিসটা টেনে চোখের কাছে নামিয়ে আনল। 'ঠিক আছে, দুজনকে একসঙ্গে রাখো।' দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘুরে রানার দিকে তাকাল একবার। 'কাল দেখা হবে, মিস্টার রানা। যা বলেছি চিন্তা করে দেখবেন।'

গার্ডরা অস্ত্রের মুখে কামরা থেকে বের করে আনল রানাকে। করিডরের আরেক মাথায় চলে এল ওরা। এদিকের দেয়ালে একপ্রস্থ পাথুরে ধাপ তৈরি করা হয়েছে, উঠে গেছে উপর দিকে। সিঁড়ির মাথায় লোহার গ্রিল দেখা যাচ্ছে। গ্রিলের ওপারে একজন সেন্ট্রি রয়েছে, তালাটা খুলে দিল।

রানাকে নিয়ে একটা চওড়া প্যাসেজে ঢুকল গার্ডরা। কয়েকটা সেলকে পাশ কাটাল ওরা। থামল লোহার একটা গেটের সামনে। এখানেও তালা খোলার আগে ওদেরকে ভাল করে দেখে নিল একজন সেন্ট্রি।

প্যাসেজের এদিকটা অন্ধকার, সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। অবশেষে লম্বা একটা গ্যালারিতে বেরিয়ে এল। গ্যালারির শুধু একদিকে এক সারি পিলার দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর মাঝখানে বরফি-আকৃতির স্টিলের জাল রয়েছে, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত; অনেক নীচে দেখা গেল দুর্গের মূল হল।

দুর্গের ছাদ গম্বুজ আকৃতির। ওক কাঠের কড়িকাঠ কালের আঁচড়ে কালো হয়ে গেছে। হলের প্রতিটি প্রান্তে পাথরের তৈরি সরু কারনিস দেখল রানা, পাথুরে পিলারগুলো ওই কারনিস থেকে খাড়া হয়েছে।

হলের ওপারে, ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে, আরও একটা গ্যালারি দেখতে পাচ্ছে রানা, সেটায় কোনও জাল নেই।

গ্যালারির শেষ প্রান্তে পৌঁছাল ওরা, আবার থামল লোহার একটা গেটের বাইরে। তালা খুলে দিয়ে রানার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে একবার তাকাল সেন্ট্রি লোকটা। তারপর ডানদিকের একটা দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, 'ইরাম!'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল টেনেটুনে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা এক লোক। তবে অস্বাভাবিক চওড়া, ব্যায়ামপুষ্ট, নিরেট শরীর। হাত দুটো এত লম্বা যে হাঁটুর নাগাল পেয়ে যাচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত একটা মুখ। মাথার চুল কাঁধ ছুঁয়েছে।

তার এক হাতে চাবির গোছা, কোমর থেকে নেমে যাওয়া ট্রাউজারটা টেনে তুলল অপর হাত দিয়ে। 'কী ব্যাপার?' সামনে এসে জানতে চাইল।

'বিদেশি স্পাই,' গার্ডদের একজন বলল। 'কর্নেল হুকুম দিয়েছেন, ওই লোকটার সঙ্গে একেও হোলে রাখতে হবে। বললেন, এর ব্যবস্থা কাল করবেন তিনি।'

'বিদেশি স্পাই! নিশ্চয়ই মুসলমান?' জিজ্ঞেস করল ইরাম, একজন গার্ডকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বড় করে শ্বাস নিয়ে রানার মুখে একদলা থুথু ছিটাল সে। 'শালাকে জ্যান্ত পোড়াতে পারলে না!'

সারা মুখে ঠাণ্ডা, আঠাল থুথুর স্পর্শ পেয়ে ঘিনঘিন করে উঠল গা, সেই সঙ্গে রানার ভিতরে কী যেন একটা ছিঁড়ে গেল। এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা সমস্ত রাগ ও আক্রোশ বিস্ফোরিত হলো জুতসই একটা ঘুসির মাধ্যমে, ইরামের চোয়াল প্রায় গুঁড়িয়ে দিল ঘুসিটা।

সৈনিক দুজন নড়ল এক পলক পর। একটা অস্ত্রের বাঁট দড়াম করে রানার পিঠে পড়ল, আরেকটা লাগল খুলির পাশে। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল দুনিয়াটা।

# বারো

গভীর অন্ধকার থেকে হালকা ছায়ায় উঠে আসবার অনুভূতি হলো। গদিবিহীন লোহার কট-এ শুয়ে রয়েছে রানা, স্প্রিংগুলো পিঠে বিধছে, ব্যথা করছে।

বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। দেয়ালের গায়ে সরু ফাটল দেখা যাচ্ছে, ভিতরে ঢুকছে স্লান আলোর একটা টানেল। তাতে শুধু আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কামরাটা। একটু শীত শীত করছে রানার। সাবধানে বসল, তারপর পা নামাল মেঝেতে। নড়াচড়া করায় ব্যথাটা বাড়ল, মাথার পাশে হাত দিতে জমাট বাঁধা রক্ত ঠেকল আঙুলে।

'কে ওখানে?' ইংরেজিতে জানতে চাইল রানা।

'আপনি কে? বিদেশি মনে হচ্ছে?' কামরার আরেকদিক থেকে ভেসে এল পাল্টা প্রশ্ন। মার্জিত কণ্ঠস্বর, তবে ইংরেজি বলায় খুব একটা অভ্যস্ত নয়। 'ইন্টারেস্টিং তো!'

রানা ধরতে পারল না কথার মধ্যে ঠিক কোন্ দেশি টান। 'পরিচয় দেবেন না, প্লিজ?' বলল ও।

বেশ লম্বা-চওড়া কাঠামোটা, অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। রানার পাশে এসে বসলেন ভদ্রলোক। 'নিকিতা লেমনস্কি, কর্নেল, থারটি-ফার্স্ট রেজিমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং।'

চমকে উঠল রানা। 'হোয়াট! কী বললেন? আপনি সেই বিখ্যাত রুশ...'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন রাশিয়ান কর্নেল। 'আপনি শুনতে ভুল করেননি,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন তিনি। 'আমিই সেই জগৎবিখ্যাত, আদি ও অকৃত্রিম মিসাইল ইঞ্জিনিয়ার নিকিতা লেমনস্কি।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব!' রানার বিস্ময় বাধ মানছে না। 'সবাই জানে মাস তিনেক আগে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন আপনি।'

'দেখতেই পাচ্ছেন সেটা ভুল,' বলে বেসুরো গলায় হাসতে চেষ্টা করলেন লেমনস্কি। 'তবে এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল।'

'তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আপনি এলেন কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'সে অনেক কথা, এই মুহূর্তে স্মরণ করতে ভাল লাগছে না।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা, বাংলাদেশী। এই জায়গাটা কী?'

'এটাকে ওরা হোল বলে,' জানালেন বিখ্যাত মিসাইল ইঞ্জিনিয়ার। 'দুর্গের পুরু প্রাচীর কেটে তৈরি করা। দিনে গরম, রাতে শীত। এখন যদি ঠাণ্ডায় কষ্ট লাগে, সকালে কান্না পাবে। কোনও খাবার দেয়া হয় না, আলো নেই, কটে বিছানা নেই।'

'নরম করার কৌশল?'

মাথা ঝাঁকালেন রাশিয়ান ভদ্রলোক। 'ঠিক তাই। দিনের আলো না পেলে দেখতে পাবেন না জায়গাটা কেমন।'

রানার একটা হাত আপনাআপনি বুক পকেটে উঠে গেল। লাইটারটা বের করল। 'বোধহয় ইচ্ছে করেই নেয়নি ওরা,' বলে জ্বালল সেটা।

রানার চোখের সামনে স্বাস্থ্যবান, অথচ ক্লান্ত একজন মানুষের চেহারা আলোকিত হয়ে উঠল; চোখগুলো কোটরের ভিতরে ঢোকা, চোয়ালের হাড়ে টান টান হয়ে সেঁটে আছে চামড়া।

মুখভর্তি নোংরা দাড়ি-গোঁফ। তবে চোখে ভয়-ডর বলে কিছু নেই, দৃষ্টিতে ফুটে আছে চারিত্রিক দৃঢ়তার ছাপ।

আলোটা নিজের চারদিকে ঘোরাল রানা। ছোট একটা চারকোনা কামরা, দেয়াল ও মেঝে পাথরের। দেয়ালের গায়ে সরু ফাটলটা নয় কি দশ ইঞ্চি লম্বা, পাঁচ ইঞ্চি চওড়া। লোহার কট দুটো ছাড়া আর কোনও ফার্নিচার নেই। কাঠের দরজা, তবে ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া। দরজার গায়ে খুদে একটা গ্রিল আছে, তাতে চোখ রেখে প্রায় অন্ধকার করিডরের খানিকটা দেখতে পেল ও। দূর থেকে গোঙানোর অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

'কেউ কি কাঁদছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হামাস কিংবা হিযবুল্লাহ বন্দিদের কেউ,' বললেন রুশ মিসাইল এক্সপার্ট। 'সারাদিন টরচার করা হয়েছে ওদেরকে।'

'আমি যদি চেঁচাই, ইরাম টরচার করতে আসবে?'

মাথা নাড়লেন লেমনস্কি। 'রোজ রাতেই সেলগুলোয় মারপিট ও চিৎকার-চেঁচামেচি হয়, কিন্তু নিজের কামরা ছেড়ে বেরোয় না সে। দিনে যখন আসে, সব সময় একজন সশস্ত্র গার্ড থাকে সঙ্গে।'

লাইটার ধরা হাতটা মাথার উপর তুলল রানা। মেঝে থেকে ফুট দশেক উঁচুতে একজোড়া ভারী কড়িকাঠ রয়েছে, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত। ওগুলোর দৈর্ঘ্য জুড়ে, খানিক পরপর, ইস্পাতের হুক বেরিয়ে আছে।

'ওগুলোর কাজ কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আন্দাজ করুন,' বললেন ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। 'আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি কর্নেল ইয়েলিচ এখানে যখন শো করেন, আমাকে যেন তা দেখতে না হয়।'

লাইটার নিভিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'বিখ্যাত একজন রুশ মিসাইল এক্সপার্টকে ইজরায়েলিরা বন্দি করে রেখেছে, হইচই

পড়ে যাবার কথা না?' জিজ্ঞেস করল ও।

'শুনুন তা হলে, কী হয়েছে বলি...'

নিকিতা লেমনস্কি যা বললেন সংক্ষেপে তা এরকম:

মাস তিনেক আগে তুরস্ক থেকে লেবানন হয়ে তুর্কি এয়ারলাইন্সের একটা প্লেনে চড়ে মিশরে যাচ্ছিলেন লেমনস্কি।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্তের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করে প্লেনটা। ক্রুসহ প্লেনের সব কজন আরোহী মারা যায়, বেঁচে যান একমাত্র তিনিই। অকুস্থল থেকে ইজরায়েলিরা উদ্ধার করে তাঁকে। আরোহীদের সব লাশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি, ফলে কোনও রকম সন্দেহ ছাড়াই ধরে নেওয়া হয় লেমনস্কিও বেঁচে নেই।

তাঁকে উদ্ধার করার খবরটা চেপে যায় ইজরায়েলিরা। এবং অবিশ্বাস্য একটা প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে মার্কিনিদের কাছ থেকে প্রচুর মিসাইল পেলেও, তাদের কাছে চিরকাল নতজানু থাকতে চায় না ইজরায়েল, দাঁড়াতে চায় নিজের পায়ে। মিসাইল তৈরির বিরাট একটা প্রজেক্ট শুরু করতে চায় তারা, কিন্তু কাজে হাত দিতে পারছে না দক্ষ একজন মিসাইল এক্সপার্টের অভাবে।

লেমনস্কিকে পেয়ে তারা যেন চাঁদ ধরে ফেলেছে। মাসিক দেড় লাখ মার্কিন ডলার বেতন, মার্সিডিজ গাড়ি, ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, ইজরায়েলি নাগরিকত্ব, চেহারা বদলানোর জন্য প্লাস্টিক সার্জারির সমস্ত খরচ ইত্যাদি নানা রকম টোপ ফেলা হলো লেমনস্কির সামনে। কিন্তু সে-সব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। তারই পরিণতি এটা, হোল-এ বন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁকে।

'আর আপনি?' নিজের কথা শেষ করে লেমনস্কি জানতে চাইলেন। 'আপনি কেন এখানে?'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু চেপে রাখার কোনও মানে হয় না।

ওর কথা শেষ হতে মাথা নাড়লেন কর্নেল লেমনস্কি। 'ভয় পাচ্ছি আপনার ওপর অনেক জুলুম করবে ইয়েলিচ।'

কট থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল রানা, গ্রিল দিয়ে অন্ধকার করিডরে তাকাল। কোনও রকমে লোহার গেটটা দেখতে পেল, যেটা পার হয়ে গ্যালারিতে যাওয়া যায়। আর দেখা গেল ইরামের কামরার দরজা, দরজার নীচে আলোর রেখা।

'লোহার জাল কেন?'

'দু'মাস আগের কথা। একজন বন্দিকে ইন্টারোগেট করতে আনা হচ্ছিল, নীচে লাফ দেয় সে। খেপে গিয়ে গার্ডকে এমন মার মেরেছে ইয়েলিচ, চিরকালের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেছে সে। তারপর থেকে ওই জাল লাগানো হয়েছে।'

'হলের উল্টোদিকে একই রকম আরেকটা গ্যালারি দেখেছি আমি,' বলল রানা। 'ওদিকে কোনও জাল নেই।'

'ওদিকটা অফিসার্স কোয়ার্টার। প্রথমে ওখানেই আমাকে রেখেছিল ওরা। রীতিমত জামাই আদর করছিল। তারপর যখন প্রস্তাবটা মানলাম না...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন লেমনস্কি।

'পালাবার কথা ভেবেছেন?'

মৃদু শব্দে হাসলেন লেমনস্কি। 'প্রায়ই ভাবি, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এমনকী, সেল থেকে বেরুতে যদি পারেনও, কমপক্ষে চারটে গেট পেরুতে হবে আরও। প্রতিটি গেটে তালা মারা আছে, আছে সশস্ত্র পাহারা।'

'কিন্তু কেউ যদি গেটগুলোকে এড়িয়ে যেতে চায়?'

'বুঝলাম না।'

ফিরে এসে কটে বসল রানা। 'দুর্গের মূল ছাদটাকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে প্রকাণ্ড সব খাড়া পিলার। দু-পাশ থেকে কড়িকাঠ আর ওই পিলারগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে হলের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে কংক্রিটের কারনিস।'

‘বুঝলাম। তাতে কী?’ রানার পাশেই বসলেন লেমনস্কি।

‘শক্ত ও সাহসী একজন মানুষ ওই কারনিস ধরে অফিসার্স কোয়ার্টারে পৌঁছাতে পারে।’

‘তাকে অত্যন্ত বেপরোয়াও হতে হবে,’ বললেন লেমনস্কি। ‘কারনিসটা সম্ভবত নয় ইঞ্চি চওড়া। আর ওখান থেকে নীচের মেঝের দূরত্ব আশি ফুট।’

‘হবেন নাকি বেপরোয়া?’

‘অবশ্যই। কিন্তু ছোট একটা পয়েন্ট আপনি ভুলে গেছেন। প্রথমে সেল থেকে বেরিয়ে গ্যালারিতে পৌঁছাতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব?’

‘সেটা সম্ভব ইরামকে এখানে আনিয়ে, চাবির বোঝা থেকে তাকে মুক্ত করে।’

‘কিন্তু আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি,’ ধৈর্য না হারিয়ে বললেন লেমনস্কি, ‘রাতে কখনো সেলে আসে না ইরাম। যখন আসে, প্রতিবার সঙ্গে একজন গার্ড থাকে। আমরা যদি কোনও রকম গোলমাল বা মারপিট শুরু করি, ঘরে বসে মুচকি মুচকি হাসবে সে।’

‘কিন্তু তার একজন বন্দি যদি আত্মহত্যা করে?’ জানতে চাইল রানা। ‘সে যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়?’

‘এমন কেউ, খবর পাওয়া মাত্র ইরামের চামড়া ছাড়িয়ে লবণ ছিটাতে চাইবে ইয়েলিচ?’

‘ঠিক তাই।’ দাঁড়াল রানা, লাইটার জ্বেলে শিখাটা সিলিঙের দিকে তুলল। ‘এবার বলুন, গ্রিল দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে আমাদের একজনকে ওই হুক থেকে ঝুলতে দেখলে কী ভাববে ইরাম।’

‘সেলে ঢুকবে সে,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন রুশ মিসাইল বিশেষজ্ঞ। তাৎপর্যটা বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সিধে হলেন। ‘মাই গড, ইউ হ্যাভ গট ইট, মিস্টার রানা। যতক্ষণ বাঁধন কেটে দেহটাকে নামানোর সময় থাকবে, সেলের ভেতরে

তাকে ঢুকতেই হবে। ইয়েলিচ তার চামড়া তুলে নিয়ে লবণ মাখাবে, এই ভয়টা তার মাথায় অন্য কোনও চিন্তা ঢুকতেই দেবে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'আমি শুধু একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় যে আওয়াজটা হবে। ওকে তো আর বিনা লড়াইয়ে কাবু করা যাবে না।'

'ও-সব কেউ গ্রাহ্য করবে না। তখন বললাম না, রোজ রাতেই এখানে হই-হাঙ্গামা হয়।'

'ঠিক আছে তা হলে,' বলল রানা। 'এখন শুধু মঞ্চ সাজালেই হয়।'

'সেটা তেমন কঠিন কিছু নয়। আমি যেহেতু আপনার চেয়ে সাইজে কিছুটা ছোট, প্রধান চরিত্রে আমাকেই অভিনয় করতে দিন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটানোর কাজটা আপনি করুন। আপনার বেল্টটা দিন।'

দিল রানা, তারপর লাইটারটা উঁচু করল, লেমনস্কি যাতে ওটার আলোয় কাজ করতে পারেন। কোমর থেকে নিজের বেল্টটা আগেই খুলে ফেলেছেন তিনি। দুই বগলের তলা দিয়ে বের করে এনে দুই প্রান্ত আটকালেন, ওটার ভিতর রানার বেল্ট ঢুকিয়ে একটা লূপ তৈরি করলেন, তারপর লূপটা ঠেলে দিলেন পিছনদিকে।

খুশিতে হেসে উঠলেন লেমনস্কি। 'না খাইয়ে রেখে ওরা আমার বেশ ক'পাউন্ড ওজন কমিয়ে দিয়েছে।'

ছোঁয়াচে হাসিটা রানাকেও ধরল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও, দুজনের মধ্যে সুন্দর একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে—সাহস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবণতা, শারীরিক সামর্থ্য ও উন্নতমানের মেধার অবদান।

'এবার আপনার পিঠ দিন, রানা,' বললেন লেমনস্কি।

শরীরটাকে শক্ত করল রানা। সেটা বেয়ে দ্রুত উঠে গেলেন

লেমনস্কি, ওর কাঁধে পা দিয়ে সাবধানে ভারসাম্য রক্ষা করছেন। লাইটার ধরা হাতটা যতদূর সম্ভব উপর দিকে তুলল রানা। একটু পরেই হালকা হয়ে গেল ওর কাঁধ।

মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল রানা। একটা হাত কড়িকাঠে পেঁচিয়ে ঝুলছেন লেমনস্কি, খালি হাতটা দিয়ে লেদার লূপের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড শক্তি তাঁর শরীরে। লূপটা একটা হুকে আটকালেন তিনি, বড় করে শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে নিচু করলেন নিজেকে।

সামান্য ভৌতিক আওয়াজ তুলে তাঁর শরীরটা দুলতে লাগল। তারপর যখন মাথাটা একদিকে কাত করলেন, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার আয়োজনে আর কোনও ত্রুটি থাকল না।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

'ওহ্, দারুণ!' বলল রানা। 'ওভাবেই স্থির থাকুন।'

লাইটারটা পকেটে রেখে দিয়ে দরজার কাছে সরে গেল রানা, কবাটের গায়ে দমাদম ঘুসি মারছে। করিডর থেকে ভেসে আসা প্রতিধ্বনি শুনতে পেল ও। এক মুহূর্ত পর গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে হিব্রু ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিল: 'ইরাম, খোদার দোহাই লাগে, হেলপ! লেমনস্কি সুইসাইড করছেন।'

পাঁচ সেকেন্ড পর করিডরের শেষ মাথার দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, অন্ধকারে দেখা গেল হলদেটে আলোর একটা রেখা। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল ইরাম, হাতে টর্চ। তাকে দেখামাত্র আবার চেঁচাল রানা, 'ফর গড'স সেক, কুইক! ভদ্রলোক ঝুলে পড়েছেন!'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল ইরাম। 'সুইসাইড? হায়, হায়! কীভাবে?'

শুকনো দাগে ভরা মুখটা গ্রিলের কাছে সরে আসছে দেখে সামান্য পিছাল রানা। এক সেকেন্ড পর শক্তিশালী টর্চের আলোটা অন্ধকার সেলে ঢুকে পড়ল, স্থির হলো ঝুলন্ত রাশিয়ান

ইঞ্জিনিয়ারের উপর।

শান্ত ছন্দে এদিক-ওদিক দুলছে লেমনস্কির শরীর, অপলক চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে পড়বে, দু'সারি দাঁতের মাঝখান থেকে বেরিয়ে রয়েছে জিভটা।

ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ইরামের। গ্রিল থেকে সরে গেল আলোটা। ঝনঝন করে উঠল চাবির গোছা। পরমুহূর্তে ঘটাং করে খুলে গেল দরজা। ছুটে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল সে, হাত বাড়িয়ে লেমনস্কিকে ধরতে যাচ্ছে।

আরও উঁচু হলেন লেমনস্কি, যেন চাইছেন না ইরাম তাকে স্পর্শ করুক। তারপর কড়িকাঠটা ভাল করে ধরলেন, দুই পা এক করে কষে লাথি মারলেন ইরামের মুখে।

ছিটকে দেয়ালে বাড়ি খেল ইরাম, হাত থেকে পড়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে টর্চ। সিধে হতে চেষ্টা করছে সে, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে গেল রানা। থেঁতলানো মুখে মন খুলে ঝেড়ে একটা লাথি মারল ও।

অন্য কেউ হলে তাজা ক্ষতের উপর এরকম আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত, কিন্তু রানাকে অবাক করে দিয়ে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল ইরাম, তারপর অস্বাভাবিক লম্বা হাত দিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরল।

অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে, দেরি করবার উপায় নেই। চট্ করে দুই হাতে ইরামের কড়ে আঙুল দুটো ধরে ফেলল রানা, তারপর জোরে একটা ঝাঁকি দিল বাইরের দিকে। একসঙ্গে মট করে ভেঙে গেল আঙুল দুটোর হাড়। সঙ্গে সঙ্গে ঢিল হয়ে গেল গলার চাপ। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল ইরাম। কিন্তু বেশিক্ষণ গোঙাতে পারল না, যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে – পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ড দুই হাতে অন্তত পনেরোটা ঘুসি মারল রানা ওর নাক-মুখ-কান ও চিবুকে।

ঝুপ করে মেঝেতে নামলেন লেমনস্কি। টর্চটা তুলে প্রথমে

দেখে নিলেন রানাকে, তারপর আলো ফেললেন ধরাশায়ী ইরামের উপর। জ্ঞান নেই, চোখ ওল্টানো, গল গল করে রক্ত ঝরছে নাক-মুখ-কান দিয়ে, বুকের কাছে মেঝেতে পড়ে রয়েছে চারটে রক্তাক্ত দাঁত। কষে একটা লাথি মারতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন লেমনস্কি। হাঁপাচ্ছে রানা, হাত দিয়ে ডলছে গলাটা, দেখতে পেল চাবির গোছাটা তালায় ঝুলছে।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। দরজায় তালা মেরে দিয়ে চাবির গোছা হাতে স্থির হয়ে দাঁড়াল রানা। কান পেতে আছে দুজনেই। কোথাও থেকে কোনও শব্দ আসছে না। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কিছু নড়ছেও না।

গ্যালারিতে আলো খুব কম। কয়েকবার চেষ্টার পর একটা চাবি ম্যাচ করল। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবার তালা লাগাল গেটে।

নীচের হলেও আলো খুব কম। উপর দিকে তাকিয়ে রানা দেখল ছাদটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। স্টিলের জাল কোনও সমস্যা হলো না, দুজন মিলে টান দিতেই দেয়াল থেকে ক্লিপ খুলে একটা ফাঁক তৈরি হলো।

প্রথম পিলারটা কারনিস থেকে উপরে উঠেছে ফুট তিনেক বামে। বাতাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে সাবধানে এগোল রানা। কাজটা এত সহজ, অবাক লাগল ওর। লেমনস্কি না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। কোনও কথা হলো না।

কারনিস মাত্র নয় ইঞ্চি চওড়া, আবার সেটা বরাবর সাবধানে এগোল রানা। এত অল্প জায়গায় ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন।

সময়ের যেন কোনও অর্থ নেই। ধীর হলেও, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বিরতিহীন বাম দিকে এগোচ্ছে রানা। আঙুলের ডগায় পরবর্তী পিলারের স্পর্শ বিস্মিত করল ওকে। একমুহূর্ত বিশ্রাম নিল ও, লেমনস্কির জন্য অপেক্ষা করাও হলো। কাছে আসতে অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল ঘামে ভিজে গেছে তাঁর মুখ, তবে

চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে হাসলেন।

'এগোন!' বললেন তিনি। 'হাতে সময় নেই!'

আরও তিনটে পিলারকে পাশ কাটাতে হবে। আবার শুরু করল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ওর কানে অস্বাভাবিক জোরাল শোনাচ্ছে। হঠাৎ সেটাকে চাপা দিয়ে ঘটাং করে উঠল একটা লোহার দরজা। দেয়ালের গায়ে স্থির হয়ে গেল রানা। চোখ নামিয়ে নীচে তাকাল।

হলে খানিকটা আলো দেখা যাচ্ছে, সেই আলোর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন সৈনিক। সিগারেট ধরাবার জন্য একবার থামল সে, তারপর আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার আড়াআড়ি ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল রানা। দু'মিনিট পর রেইলিং টপকে দ্বিতীয় গ্যালারিতে পৌঁছে গেল।

লেমনস্কিও নিরাপদে পৌঁছালেন। ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে দুজন। কোথাও একটা দরজা খোলার আওয়াজের সঙ্গে ভেসে এল হাসির শব্দ। দরজা বন্ধ হতে আবার নীরবতা।

'এদিকটা আমি চিনি,' বললেন লেমনস্কি। 'এই করিডরের শেষ মাথায় একটা সার্ভিস লিফট বসিয়েছে ওরা। ওটায় চড়ে সোজা গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে পারব। সামনে পড়বে আরদালিদের কোয়ার্টার। ওখান থেকে বাইরে বেরুবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। করিডর ধরে পথ দেখালেন লেমনস্কি। লিফটের নতুন দরজা চকচক করছে, প্রাচীন একটা দুর্গের ভিতর একেবারেই বেমানান।

বোতাম টিপে উপরে আনা হলো লিফট। তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, শুরু হলো অধঃপতন। এত দ্রুত নামছে যে, পেটে শূন্য একটা অনুভূতি হলো ওর। দরজা খুলে গেল। সামনে বড়সড় একটা বেযমেন্ট খালি পড়ে আছে।

বেযমেন্টের দরজা খুলে নির্জন, আলোকিত করিডরে বেরিয়ে

এল ওরা। ওদের বাম দিকের কামরা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে, দরজাটা সামান্য ফাঁক করা। ওটাকে পাশ কাটাবার সময় ভিতরে কয়েকজন সৈনিককে দেখতে পেল রানা, টেবিলের চারধারে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। দ্রুত পা চালিয়ে লেমনস্কির পিছু নিল ও।

রাশিয়ান ভদ্রলোক অন্য একটা দরজায় কান ঠেকিয়ে শব্দ শুনছিলেন, রানা পৌঁছাতে খুলে ফেললেন সেটা। দেখে মনে হলো পাঁচ-সাতজনের কোয়ার্টার। কামরার চারপাশে বিছানা তৈরি, চাদরগুলো নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা। এক কোণের র‍্যাকে সাব-মেশিনগান ও অটোমেটিক রাইফেল দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বেডের সঙ্গে টিন লকার রয়েছে, তাতে ইউনিফর্ম ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট দেখা যাচ্ছে।

'হিব্রু তো আপনি ভালই জানেন, তাই না?' জানতে চাইলেন লেমনস্কি।

'কাজ চালিয়ে নিই,' বলল রানা।

'তা হলে এখন বেরোবার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।'

ব্যস্ত হাতে মিলিটারি গ্রেটকোট পরল ওরা, মাথায় দিল পিক ক্যাপ, হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান নিল। করিডরে ফিরে এসে দ্রুতপায়ে এগোল, কয়েকটা ধাপ টপকে উঠে এল সরু অন্য এক করিডরে, সেখান থেকে ছোট একটা হলে পৌঁছানো যায়।

ঢোকার মুখেই, একপাশে, কাঁচ দিয়ে ঘেরা অফিস। অলসভঙ্গিতে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে একজন গার্ড, মুখে সিগারেট। লেমনস্কি ও রানা শান্ত ভাবে পাশ কাটাচ্ছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে সাব-মেশিনগান। একটা হাত তুলে গার্ডের উদ্দেশে নাড়ল রানা। ওদের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে গার্ডও হাত নেড়ে সাড়া দিল।

বাইরে বৃষ্টি। পাথুরে কয়েকটা ধাপ টপকে চওড়া উঠানে নেমে এল ওরা, অন্ধকারে হাঁটছে। 'ট্রাকগুলো সব এখানেই

আসে,’ বললেন লেমনস্কি। ‘ফ্রন্ট গেটে পৌঁছাতে হলে আরও হাঁটতে হবে। বাইরে বেরুবার ওটাই একমাত্র পথ।’

তাঁর বাহু ছুঁল রানা, হাত তুলে সামনেটা দেখাল। কয়েক ফুট দূরে আলোকিত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জিপ।

সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন লেমনস্কি, ‘অফিসার্স মেস।’

‘মন্দ কী,’ বলল রানা। ‘চলুন দেখা যাক কেউ চ্যালেঞ্জ করে কি না।’

উঠানের ভেজা পাথুরে মেঝের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল ওরা। হুইলের পিছনে উঠে বসে স্টার্টারে চাপ দিল রানা। অপর সিটে উঠে পড়লেন লেমনস্কি, জিপ চলতে শুরু করল।

কান খাড়া করে আছে রানা, পিছন থেকে হঠাৎ কেউ চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। খানিক পর সামনে গেট দেখা গেল। বড় বেশি সহজ লাগছে সব। তখনও বিশ গজ দূরে ওরা, সুইং বারটা সরিয়ে নিল গার্ড। কয়েক মুহূর্ত পর রাতের অন্ধকার ভেদ করে ছুটল ওদের মিলিটারি জিপ, গন্তব্য: আবুযার বন্দর।

# তেরো

সৈকতের দিকে ঘুরে গেল জিপ। হারবারের ওদিক থেকে পাতলা কুয়াশা ছড়াচ্ছে। অনেক জানালায় আলো দেখা গেলেও, রাস্তা-ঘাট খালি। জাহিদির হোটেল থেকে কয়েক গজ দূরে ব্রেক কষল রানা। পরিবেশটা বড় বেশি নীরব।

‘ভুল করছেন না তো, ঠিক এখানেই আপনার বন্ধুদের থাকার কথা?’ জিজ্ঞেস করলেন লেমনস্কি।

‘এখানে থাকাটাই উচিত। তাদের আর কোথায় খুঁজতে হবে আমার জানা নেই,’ বলল রানা। ‘আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। কী অবস্থা আমি দেখি।’

হোটেলের সামনে চলে এসে জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল রানা। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে জাহিদি, একটা টেবিলে বসে তাস খেলছে তিনজন বৃদ্ধ।

জিপ ও লেমনস্কির কাছে ফিরে এসে রানা বলল, ‘এখানে তারা নেই। হয়তো পেছনে কোথাও আছে।’

হোটেল বিল্ডিঙের পাশের গলি ধরে কয়েক গজ এগোল রানা, তারপর পাথরের স্ল্যাব বসানো উঠানটায় ঢুকে পড়ল। খিড়কি দরজায় তালা দেওয়া হয়নি। সাদা চুনকাম করা বেশ বড় একটা কিচেনে পা রাখল ওরা।

ছোট বাস্কেটে সাদা-কালো রঙের একটা কুকুরছানা ঘুমাচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠে ছুটে এল সেটা, অনবরত ডাকছে। আদর করবার জন্য ঝুঁকল রানা, এই সময় একটা দরজা খুলে কিচেনে ঢুকল জাহিদি।

‘কী চান আপনারা?’ রাগের সঙ্গে জানতে চাইল সে। পরমুহূর্তে রানাকে চিনতে পেরে দম আটকাল, একমাত্র চোখটা ছানাবড়া হয়ে উঠল তার। তাড়াতাড়ি উঠানের দিকের দরজাটা বন্ধ করল সে, কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ‘হে আল্লাহ, রহমত করো!’

‘আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই,’ আরবীতে বলল রানা। ‘আমি শুধু জানতে এসেছি মোল্লা বখতিয়ার আর তার মেয়ে কোথায় আছে।’

রানাকে দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে জাহিদি। ‘ইয়েলিচ যদি জানে যে আমি আপনাকে সাহায্য করেছি, খুন করার আগে এক হপ্তা সিলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে।’

‘আপনি বুদ্ধিমান হলে সে জানবে না।’

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল জাহিদি। এক মুহূর্ত পর কয়েক পা এগিয়ে আরেকটা দরজা খুলল সে। ‘দেখে যান।’

দেয়াল ঘেঁষা বিছানায় চোখ বুজে পড়ে আছে মোল্লা বখতিয়ার, মুখ সামান্য খোলা। কোলের কাছে হুইস্কির একটা খালি বোতল কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

ঝুঁকলেন লেমনস্কি, বুড়ো বখতিয়ারের চোখের পাতা উল্টে দেখলেন, পালসও পরীক্ষা করলেন। রানার দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন তিনি। ‘সহজে জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না।’

জাহিদির দিকে তাকাল রানা। ‘এই অবস্থা কতক্ষণ চলছে?’

‘কয়েক ঘণ্টা। বোটটা ফিরে পাবার জন্যে কর্নেল ইয়েলিচের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু গার্ডরা তাকে দুর্গের ভেতর ঢুকতে দেয়নি। ফেরার সময় খবর পায় বোটটাকে হারবারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটাকে পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড। আমি ছিলাম না, হোটেলে ফিরে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে বসে...’

‘কিন্তু মেয়েটা?’

‘মেয়ের কথায় কান দেয়নি মোল্লা।’

‘আইরিন এখন কোথায়?’

‘কর্নেল ইয়েলিচের সঙ্গে দেখা করতে গেছে,’ বলল জাহিদি। ‘ভুলের জন্যে মাফ চেয়ে, কেঁদে-কেটে, হাতে-পায়ে ধরে বোটটা ফেরত আনবে।’

গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চোখ-মুখ। ‘কোনও লাভ হবে না।’

‘হতেও পারে, মিস্টার রানা। কম বয়েসি অমন সুন্দরী...’ আরও কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল জাহিদি।

সেটা লক্ষ করে রানার গলা শুকিয়ে গেল। ‘কর্নেল ইয়েলিচ থাকে কোথায়? দুর্গেই?’

মাথা নাড়ল জাহিদি। ‘শহরের বাইরে, আধ মাইল দূরে, তার একটা ভিলা আছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানের ভেতর।’

‘কজন গার্ড জানেন?’

‘গেটে একজন, ভেতরে তিনজন। আরও আছে কর্নেলের এইড, লেফটেন্যান্ট হেবরন রাফা। কর্নেলের সিকিউরিটির দিকটা দেখাও তার দায়িত্ব, ভিলার ভেতরেই থাকে।’

কী করা যায় চিন্তা করছে রানা, রাশিয়ান কর্নেল লেমনস্কি বললেন, ‘আপনি ওখানে যাবার কথা ভাবছেন?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘জিপটা নিয়ে যাচ্ছি। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি, হারবার থেকে একটা বোট চুরি করে কেটে পড়বেন আপনি। ঠিক আছে?’

‘নো, নেভার!’ মাথা নাড়লেন লেমনস্কি। ‘যখন যাব, একসঙ্গে যাব। তা ছাড়া, ইয়েলিচের সঙ্গে আরেকবার দেখা করতে চাই আমি।’

‘সেক্ষেত্রে মোল্লা বখতিয়ারকে সঙ্গে রাখি,’ বলল রানা। ‘এখন থেকে খুব দ্রুত মুভ করার দরকার হবে। ওকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।’ জাহিদির দিকে ফিরল ও। ‘বাইরে আমাদের একটা জিপ আছে।’

‘মোল্লাকে আমি তুলে দিয়ে আসছি,’ বলল সে।

অচেতন বুড়োকে কাঁধে ফেলে রানা ও লেমনস্কির পিছু নিল জাহিদি, উঠান ধরে বেরিয়ে এল সরু গলিতে, সেখান থেকে বাঁক নিয়ে নিজের হোটেলের সামনে এসে থামল। ধরাধরি করে জিপের পিছনের মেঝেতে শুইয়ে দেওয়া হলো তাকে।

হুইলের পিছনে উঠে বসল রানা। ‘ধন্যবাদ, জাহিদি।’ লেমনস্কিও উঠে বসলেন, জিপ চলতে শুরু করল।

‘আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন,’ বিড়বিড় করল জাহিদি, দু’হাত তুলে ওদের জন্য প্রার্থনা করছে।

ইজরায়েলি কর্নেল আইজ্যাক ইয়েলিচের ভিলায় পৌঁছে রট আয়রনের গেট খোলা দেখল রানা। খিলানের মাথায় ঝোলানো ল্যাম্পটা বাতাসে দুলছে, আলোর ছোটখাট একটা বন্যা ছুটে এসে দূর করছে অন্ধকার, তারপর আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

মিলিটারি জিপটাকে আসতে দেখে সেন্ট্রি বক্স থেকে বেরিয়ে এল গার্ড, হাত তুলে ওদেরকে থামবার ইঙ্গিত করল। গতি কমালেও, থামছে না রানা। 'কর্নেল ইয়েলিচের জন্যে আর্জেন্ট ডিসপ্যাচ,' গলা চড়িয়ে বলল ও। হাত ঝাঁকাল গার্ড, ঘুরে সেন্ট্রি বক্সের ভিতর ঢুকল।

লনের বাগানে ফুল আর ফুল, যেন রঙের দাঙ্গা লেগে গেছে। পামগাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিল ঘেঁষে। মৃদু বাতাস পেয়ে রাতের আকাশে খসখস শব্দ করছে পাতাগুলো। ড্রাইভওয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। ব্রেক কষে সদর দরজায় থামল রানা।

ধাপগুলো দ্রুত টপকে এসে চওড়া হলরুমে ঢুকে পড়ল ওরা। ঠাণ্ডা, শান্ত পরিবেশ, নীরব। একদিকের দরজা দিয়ে কারও গানের সুর ভেসে আসছে – দেশাত্মবোধক গান, পবিত্র ভূমি ইজরাইলকে স্বাধীন রাখার জন্য আত্মত্যাগের আহ্বান।

দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন লেমনস্কি। কামরার মাঝখানে টেবিলে বসে দাবা খেলছে দুজন লোক। আরেকজন বসে আছে দেয়াল ঘেঁষে রাখা চেয়ারে, কোলের উপর গিটার।

'উঠে দাঁড়াও সবাই!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা, হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে আছে।

চমকে উঠল লোকগুলো। তারপর মাথার উপর হাত তুলে ধীরে ধীরে দাঁড়াল। দুজনের বয়স কম, আঠারো কি উনিশ। তবে গিটার প্লেয়ারের বয়স হয়েছে, চোখ-মুখ কঠিন।

'লেফটেন্যান্ট রাফা কোথায়?' হিব্রু ভাষায় জানতে চাইল রানা।

কেউ মুখ খুলল না। ঝট করে সামনে এগিয়ে সাব-

মেশিনগানের ব্যারেলটা এক ছোকরার পেটে সেঁধিয়ে দিল রানা। আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় সে?'

'কেউ মুখ খুলো না,' নিষেধ করল গিটার প্লেয়ার। 'বেশি দূর যেতে পারবে না ওরা।'

মেশিনগানটা উল্টো করে নিয়ে তৈরিই ছিলেন লেমনস্কি, লোকটা থামতেই তার মুখে বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মারলেন। পিছিয়ে গেল সে, নাকের ব্রিজ ভেঙে সমান হয়ে গেল চেহারাটা, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে; নাক দিয়ে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে।

পেট চেপে ধরা ছোকরার দিকে ফিরলেন লেমনস্কি। তাঁকে এক-পা এগোতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল সে, 'কিচেনে, সার। করিডরের শেষ দিকে ওটা, সিঁড়িকে পাশ কাটাতে হবে।'

'চাকর-বাকররা কোথায়?'

মাথা নাড়ল ছোকরা। 'রাতে তারা কেউ ভিলায় থাকে না।'

'একটা মেয়ে এসেছিল এখানে। তার খবর বলো।'

ঢোক গিলল ছোকরা। 'কর্নেলের কাছে আছে। কর্নেল বলে দিয়েছেন তাঁকে যেন বিরক্ত করা না হয়।'

'ঘরটা কোন্‌দিকে?'

বলে দিল ছোকরা।

'সব বুঝতে পারছেন তো?' লেমনস্কিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রায় সব,' বললেন রুশ ইঞ্জিনিয়ার। 'আপনি মেয়েটিকে নিয়ে আসুন। আমি এই তিনজনকে দেখছি।'

করিডর ধরে হন হন করে এগোল রানা, সিঁড়িটাকে পাশ কাটাল, বাঁক ঘুরে পা রাখল আরেকটা সরু করিডরে। সামনেই দরজা, কবাটের তলায় আলো দেখা যাচ্ছে। হাতলটা ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাল। দরজার দিকে পিছন ফিরে স্টোভে ডিম ভাজছে লেফটেন্যান্ট হেবরন রাফা।

ঘুরে প্লেটভর্তি পাউরুটির দিকে হাত বাড়িয়েছে সে, রানাকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। 'কে তুমি? কী চা...'

রাফার কথা তখনও শেষ হয়নি, মেশিনগানের বাঁট দিয়ে তার ঘাড়ের পাশে মারল রানা। গুঙিয়ে উঠে টেবিলে ধাক্কা খেল হেবরন রাফা। মেঝেতে নেতিয়ে পড়বার পর আর নড়ল না।

মুখের ঘাম মুছে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। কাছাকাছি কোথাও থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। করিডর ধরে সাবধানে এগোল ও। একটা বাঁক ঘুরল। থামল আরেকটা দরজার সামনে। এই ঘরেই কথা হচ্ছিল, ছোকরা মিথ্যে বলেনি। এক কি দু'মুহূর্ত অটুট হয়ে থাকল নীরবতা। তারপর হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে উঠল কেউ, একই সঙ্গে হেসে উঠল একজন পুরুষ। কর্নেল ইয়েলিচের গলার আওয়াজ চিনতে পারল রানা।

কবাট খুলে ভিতরে ঢুকল ও।

সাজানো কামরা। মেঝে ঢাকা পড়ে আছে ভারী ইন্ডিয়ান কার্পেটে। খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর বাইরে কালো রাত, পরদাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে।

পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি ডিভানে ছটফট করছে আইরিন। ওর জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে নামিয়ে দিয়েছে জানোয়ারটা মেঝেতে, কিন্তু নিজেরগুলো খুলবার সময় পায়নি। বাচ্চা মেয়েটির উপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কর্নেল। নিজের বিশাল শরীর দিয়ে তাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে, তরুণীর উঠতি যৌবন উপভোগ করছে সারা শরীরে হাত বুলিয়ে। আবার একবার হেসে উঠে সশব্দে চুমো খেল ওর ঠোঁটে। কিলবিল করছে আইরিন, সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটার ভারী দেহের নীচ থেকে। হঠাৎ এক হাত দিয়ে ওকে ডিভানের সঙ্গে চেপে রেখে অপর হাতে প্যান্টের বোতাম খুলতে শুরু করল কর্নেল। আতঙ্কে মেয়েটি গুঙিয়ে উঠতেই খল খল শব্দে হাসল সে, 'কোনও ভয় নাই, ছুকরি, ব্যথা লাগবে না।'

পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা, হাত বাড়িয়ে টোকা দিল কামোন্মত্ত কর্নেলের কাঁধে।

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল ইয়েলিচ। রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। পরক্ষণে দ্রুত নামতে গেল বিছানা থেকে। তার একটা কনুই ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, শরীরটা ঘুরে যেতেই প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি মারল নাকে-মুখে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল চর্বিসর্বস্ব শরীরটা। ঘুরে দাঁড়াল। দিশা হারিয়ে ফেলেছে, বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে।

বিছানা থেকে নেমে ফোঁপাচ্ছে আইরিন, মেঝে থেকে তুলে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় দিয়ে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। রানা বুঝল, ঠোঁটের তাজা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, এ ছাড়া ভালই আছে সে।

'ভয় পেয়ো না। শান্ত হও,' বলল রানা, 'এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে রাখা জিপে গিয়ে ওঠো। ওখানে তোমার আব্বু আছেন।'

চোখ মুছতে মুছতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল আইরিন। আড়চোখে লক্ষ রেখেছিল রানা কর্নেল ইয়েলিচের উপর, এবার সরাসরি তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, 'উঁহুঁ!'

ডিভানের পাশে কফি টেবিলে রাখা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে লোকটা। রানা ওর তলপেটের দিকে তাক করল সাব-মেশিন গানের নল।

হাত থেকে রিসিভার ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো ইজরায়েলি কর্নেল, প্যান্টের বোতাম সব খোলা, কিন্তু চোখে-মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। 'তোমার কিন্তু শেষরক্ষা হবে না, মাসুদ রানা,' শান্ত গলায় বলল সে।

লোকটার নাভী ঘিরে কয়েকটা গুলি করল রানা। ঝাঁকি খেতে খেতে ঘুরে গেল ইয়েলিচ, ছিটকে ফায়ারপ্লেসের উপর পড়ল। ওখান থেকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। মরতে লোকটা বেশ সময় নেবে, জানে রানা, তবে এই অবস্থায় তাকে বাঁচানো সম্ভব নয় কারও পক্ষেই। ফোয়ারার মত রক্ত বেরোচ্ছে।

করিডরে এসেই গুলির আওয়াজ পেল রানা। পরমুহূর্তে দেখল গার্ড রুম থেকে পিছু হটে বেরিয়ে আসছেন লেমনস্কি, গুলি করছেন কোমরের পাশ থেকে। ধাপগুলো একসঙ্গে টপকে নীচে নামল ওরা, দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল জিপে। এরইমধ্যে পিছনে উঠে পড়েছে আইরিন, পাশে বসে বাপের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে জিপ ছেড়ে দিল রানা।

ড্রাইভওয়ের বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল ওদের দিকে ছুটে আসছে সেন্ট্রি। স্পিড বাড়িয়ে দিল রানা, হুইলটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে ঘন ঘন। একটা গুলি করলেন লেমনস্কি। লাফ দিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল লোকটা।

গেট দিয়ে বেরিয়ে আসবার পর রুশ মিসাইল ইঞ্জিনিয়ারকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ওখানে?'

শ্রাগ করলেন কর্নেল লেমনস্কি। 'গিটার-প্লেয়ার একটা চান্স নিয়ে দেখল আর কী। লাফ দিয়ে গানর্যাকের কাছে পৌঁছে একটা রাইফেল নামাতে যাচ্ছিল। ইয়েলিচের খবর কী?'

'খুব বাজে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মনে হয় বাঁচবে না।'

পিছন থেকে রানার কাঁধটা একবার ছুঁলো আইরিন। 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। এ-সব আসলে কী হচ্ছে, ভাইয়া?'

'এখন ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' বলল রানা। 'তামান্নায় উঠে আগে খোলা সাগরে বেরোই, তখন শুনো।'

'বোটটা আমরা ফেরত পাব?' দম আটকে জানতে চাইল আইরিন।

'চেষ্টা তো করবই, দেখা যাক কী হয়। ভাল কথা, ইনি নিকিতা লেমনস্কি। দুর্গ থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছি আমরা।'

ঘ্যাচ করে জেটির পাশে ব্রেক করল রানা, তারপর লাফ দিয়ে নীচে নামল।

সাগর থেকে উঠে আসা কুয়াশা এখন অনেক গাঢ়। হারবারে, পঞ্চাশ গজ দূরে, নোঙর ফেলা হয়েছে মোটর ক্রুযার তামান্নার।

রানাকে গ্রেটকোটের বোতাম খুলতে দেখে লেমনস্কি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঁতরে যাবেন?'

'ডিঙ্গি পাব কোথায়?' বলল রানা। 'তা ছাড়া, বোটে একজন গার্ড আছে, যেতে হবে নিঃশব্দে।'

ঠাণ্ডা পানিতে সাবধানে নামল রানা। ডুব সাঁতার দিয়ে এগোচ্ছে। দম নেওয়ার জন্য মাত্র একবার মাথা তুলতে হলো, দেড় মিনিটে পৌঁছে গেল বোটের কয়েক ফুটের মধ্যে। এই সময় দুর্গের চূড়ায় আশ্চর্য একটা কান্নার আওয়াজ শুরু হলো, কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে সৈনিকদের।

শব্দ শুনে তামান্নার কেবিন থেকে বেরিয়ে এল গার্ড, দ্রুত হেঁটে আসছে রেইলিং-এর দিকে। বড় করে শ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিল রানা, বোটের তলা দিয়ে সাঁতরে অপরদিকে চলে এসে মাথা তুলল উপরে, ছোট্ট ডাইভিং মইটার পাশে। ধাপ বেয়ে দ্রুত উঠে পড়ল ও। নিঃশব্দ পায়ে ডেকের উপর দিয়ে এগোল। পিছন থেকে জোরসে একটা ধাক্কা দিতেই রেইল টপকে পানিতে পড়ে গেল নিরস্ত্র গার্ড।

স্টার্ন-এ চলে এল রানা, টেনে তুলবে নোঙরটা। এই সময় মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল ডাঙায় নরক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

দুর্গের ভিতরটা এখন আলোকিত। প্রকাণ্ড গেট খুলে দেয়া হয়েছে, ভিতর থেকে লাইন দিয়ে বেরিয়ে আসছে বেশ কয়েকটা সামরিক যান। রাতের বাতাস এতটা দূরেও বয়ে নিয়ে আসছে সৈনিকদের হইচই।

সহজেই পানি থেকে উঠে এল নোঙরটা। সেটাকে ডেকে ফেলে দ্রুত হুইলহাউসে চলে গেল রানা। স্টার্টার-এ চাপ দিতে প্রথমে কিছুই ঘটল না। এরপর মরিয়া হয়ে বোতামটা চেপে ধরে রাখল। হঠাৎ খকখক করল, তারপর পুরোপুরি জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন।

জেটিতে ভিড়ছে তামান্না, রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে সৈকতের দিকে ঘুরে গেল দুটো মিলিটারি জিপ। রেইলিং টপকে লাফ দিয়ে বোটে পড়ল আইরিন, তারপর সিধে হয়ে কর্নেল লেমনস্কিকে সাহায্য করল। দুজন ধরাধরি করে বোটে নামাল মোল্লা বখতিয়ারকে। সবশেষে লেমনস্কি নামছেন। আর দেরি না করে বোট ছেড়ে দিল রানা, স্পিড বাড়াচ্ছে।

চ্যানেলে ঢুকছে বোট, হুইলহাউসে রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন লেমনস্কি। 'ওরা কি আমাদের পিছু নেবে?' জানতে চাইলেন তিনি।

মাথা নাড়ল রানা। 'হারবারে এমন কিছু নেই যেটা আমাদের এই বোটের চেয়ে বেশি স্পিড তুলতে পারবে। চিন্তা করছি চ্যানেলের মুখে, হেডল্যান্ডে, ওদের পিল-বক্সটাকে নিয়ে। ওটায় যদি লোকজন থাকে, বিপদে পড়ব আমরা।'

'মোল্লা আর তার মেয়েকে কেবিনে রেখে আসি আমি,' বললেন লেমনস্কি। 'পাল্টা ফায়ার করে দেখতে হবে বিপদটা কমিয়ে আনা যায় কি না।' হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কুয়াশার ভিতর কী আছে দেখবার জন্য চোখ কোঁচকাল রানা। বাম দিকে দুর্গ, ওটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা। দেখতে পেল তীর থেকে সাগরে বেরিয়ে এসেছে গাঢ় ও নিরেট দর্শন হেডল্যান্ড। হঠাৎ ওদের ডানদিকে অন্ধকার চিরে রঙিন স্রোতের মত এক ঝাঁক ট্রেসার ছুটল।

'হেভি-মেশিনগান,' হুইলহাউসে ঢোকার সময় চেঁচিয়ে উঠলেন লেমনস্কি। 'আপনি বোট চালান। ওদেরকে আমি সামলাচ্ছি।'

থরথর করে কেঁপে উঠল বোট, খোলে এক ঝাঁক বুলেট লেগেছে। পাশের জানালা দিয়ে সাব-মেশিনগানের ব্যারেল বের করে দিয়ে পাল্টা গুলি শুরু করলেন লেমনস্কি। আরও কিছুক্ষণ

টার্গেট প্র্যাকটিস চালিয়ে গেল ইজরায়েলিরা, তারপর লাভ হচ্ছে না দেখে থেমে গেল বুলেটবৃষ্টি।

কয়েক মিনিট পর মোটর ক্রুযার তামান্না বেরিয়ে গেল খোলা সাগরে। ছুটছে ফুল স্পিডে।

# চোদ্দো

পুবালি বাতাস তেজি হয়ে ওঠায় ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা ও বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সরে যাচ্ছে কুয়াশা, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে দৃষ্টিসীমা। মাঝারি একটা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদটা।

চার্টে একবার চোখ বুলিয়ে কোর্স সামান্য বদল করছে রানা, এই সময় ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল লেমনস্কি। 'নীচে কী করছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এখনও জ্ঞান ফেরেনি ক্যাপটেন বখতিয়ারের,' বললেন লেমনস্কি। 'আইরিন তাঁর দেখাশোনা করছে।'

'বোটের কোনও ক্ষতি?'

'চারদিকে বুলেটের গর্ত দেখা যাচ্ছে। ভাগ্যিস শুয়ে পড়েছিল মেয়েটি, তা না হলে মারা যেতে পারত।' চার্টের দিকে তাকালেন লেমনস্কি। 'কোথায় চলেছি আমরা?'

'স্যালামেস বন্দর,' বলল রানা। জিমি মোরেল সম্পর্কে যত শীঘ্রি সম্ভব সব কথা জানানো দরকার মিস্টার মেনদেরেসকে।'

'ফুয়েল?'

'হার্মোনি বন্দর ছাড়ার আগে ট্যাঙ্কগুলো ভরা হয়েছিল, তাতে

সাতশো মাইল পাড়ি দেয়া যায়।’

‘চমৎকার,’ বললেন লেমনস্কি। ‘আমার গোসল দরকার, আর পনেরো ঘণ্টার জন্যে একটা বিছানা।’

‘নিজেকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই?’

‘কীসের দুশ্চিন্তা? আপনার পছন্দমত যে-কোনও দেশে নিয়ে চলুন, সেখানকার রুশ দূতাবাসে উঠব আমি। গল্প শেষ।’

হেসে ফেলল রানা।

‘আপনি চান মাঝেমধ্যে হুইলটা ধরি আমি?’

‘অভিজ্ঞতা আছে?’

‘আছে।’

‘এখন যান, ঘুমিয়ে পড়ুন। তিন ঘণ্টা পর আসবেন।’

লেমনস্কি চলে যাওয়ার পর দেয়াল থেকে একটা চেয়ার নামিয়ে বসল রানা। হাত বাড়িয়ে একটা জানালা খুলে দিল ও, তাজা বাতাস ভরল ফুসফুসে। অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাতেই আবার পুরোটা দৃষ্টিপথ জুড়ে হাজির হলো সম্মোহনী সৌন্দর্য নিয়ে সেই প্রিয় মুখ।

‘সুরাইয়া,’ বিড়বিড় করল রানা, অনুভব করল প্রতিশোধের আগুনটা এখনও সেই আগের মতই দাউ দাউ জ্বলছে ভিতরে।

দরজা খোলার শব্দ হলো, ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করল কেউ। ঘাড় না ফিরিয়েও আইরিনের উপস্থিতি টের পেল রানা। ‘কফি চলবে তো, ভাইয়া?’ জিজ্ঞেস করল সে, একটা চেয়ার নামিয়ে বসল।

হাসিমুখে মগটা নিয়ে চুমুক দিল রানা। ‘ধন্যবাদ। তোমার আব্বু কেমন আছেন?’

‘ঠিক হয়ে যাবে। কাউকে বলবেন না, এরকম আগেও দুই-একবার হয়েছে।’

‘এভাবে মদ খেলে মানুষ মারাও যেতে পারে।’

‘মারা তো মানুষ আরও অনেক কারণেই যেতে পারে,’ ম্লান

সুরে বলল আইরিন। 'এই যেমন, কী এক অজ্ঞাত কারণে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যাচ্ছিলেন আপনি। কেন, ভাইয়া?' হঠাৎ, আবেগ ধরে রাখতে না পেরে, নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

অগত্যা সুরাইয়ার কথাটা সংক্ষেপে বলতে হলো। কীভাবে মারা গেল সে, সূত্র ধরে কোত্থেকে কোথায় এবং কেন যেতে হচ্ছে ইত্যাদি।

তারপর আইরিন জানতে চাইল, 'এরপর কী?'

'আমার আরও কাজ আছে,' বলল রানা। 'আপাতত স্যালামেস বন্দরে ফিরছি।'

খানিক পর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চেয়ার ছাড়ল আইরিন। 'দেখি আব্বু কেমন আছে।'

রাত একটায় হুইল ধরতে এলেন লেমনস্কি।

কেবিনে ঢুকে রানা দেখল মোল্লা বখতিয়ার এখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হাতের উপর মাথা রেখে তার পাশে ঘুমাচ্ছে আইরিন। স্পেয়ার বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ল ও। ঘুম চলে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কাঁধে চাপ লাগায় ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলতেই আইরিনের উদ্বিগ্ন মুখটা দেখতে পেল সামনে। ঝট করে উঠে বসে পা দুটো মেঝেতে ঠেকাল। 'কী হয়েছে?'

'বোট ঠিকমত চলছে না। কর্নেল আপনাকে ডাকছেন।'

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, একটা টেবিলে বসে ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিচ্ছে মোল্লা বখতিয়ার। 'ভাল?' জানতে চাইল ও।

অসুস্থ ও দুর্বল দেখাচ্ছে বুড়োকে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি ভাল, বাপ। আপনি তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে দেখুন কোথায় কী হয়েছে।'

কম্প্যানিওনওয়ে ধরে ডেকে ওঠার সময় রানা খেয়াল করল, বোটের দোল খাওয়ার ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, গতিও খুব কম। ডেকে উঠতেই পুবালি বাতাসের সঙ্গে আসা পানির ছিটা ভিজিয়ে দিল ওর মুখ। তবে আকাশ পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিসীমা ভাল, দিগন্তের কাছে ডুবে যাচ্ছে চাঁদটা।

হুইলের দিকে পিছন ফিরলেন কর্নেল লেমনস্কি। 'কী গোলমাল জানি না, তবে লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না আমার।'

হুইল ধরল রানা। স্টিয়ারিং আড়ষ্ট হয়ে আছে, সাবলীল ভাবটা নেই, অথচ থ্রটল পুরোপুরি খোলা। লেমনস্কির দিকে তাকাল রানা। 'যতটা পারা যায় সোজা করে ধরে রাখুন, ইঞ্জিনটা দেখে আসি আমি।'

ডকে বেরিয়ে এসেছে রানা, কম্প্যানিওনওয়ে ধরে উঠে এল আইরিন। 'নীচে কী হচ্ছে আপনার দেখা দরকার, ভাইয়া।'

তার পিছু নিয়ে কেবিনে নেমে এল রানা, থামল দরজার সামনে। মেঝেতে এক ইঞ্চি পানি জমেছে। এরইমধ্যে হ্যাচটা খুলে ফেলেছে বুড়ো বখতিয়ার।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'পানিতে ভরে উঠছে বোট। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ফুটো তৈরি হয়েছে।'

'আবুযার থেকে আমরা যখন পালাচ্ছি, মেশিনগান থেকে গুলি করেছিল ইজরায়েলি সৈন্যরা,' বলল রানা। 'পাম্পটা কোথায়?'

'স্টার্নে,' বলল আইরিন। 'আসুন দেখাচ্ছি। ওটা কিন্তু হাত দিয়ে চালাতে হয়।'

লিভারটা রানা কখনও ডান হাতে, কখনও বাম হাতে ঘোরাচ্ছে। এভাবে ঘণ্টাখানেক পানি সেচার পর বোটের মতিগতি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। লিভারটা আইরিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে হুইলহাউসে ফিরল রানা।

‘ফুল স্পিডে চালান,’ লেমনস্কিকে বলল ও। ‘সম্ভবত আবুযার থেকে পালাবার সময় ওয়াটারলাইনের নীচে বুলেট ঢুকেছে। দেখতে যাচ্ছি আমি।’

ইঞ্জিন রুমে বেশিক্ষণ থাকল না রানা।

‘কী অবস্থা?’ ওকে হ্যাচ গলে কেবিনে উঠে আসতে দেখে জানতে চাইল বখতিয়ার।

‘আরও খারাপ হতে পারত,’ বলল রানা। ‘আবুযার ছেড়েছি সাত ঘণ্টা হতে চলল– বুলেট হোলগুলো আরও যে বড় হয়নি, সেটাই আশ্চর্য। সবগুলো গর্তই বো-তে। স্যালামেস বে-তে পৌঁছাতে আর তিন ঘণ্টা লাগবে, মেরামতের কাজটা ওখানে সেরে নিলেই হবে। আপনার চিন্তা করার কিছু নেই।’

বুড়ো বখতিয়ার এখনও পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছে না। টেবিলে বসে কফির মগটা হাতে নিল সে।

হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। সব শুনে মাথা ঝাঁকালেন লেমনস্কি। তারপর বললেন, ‘বৃষ্টি আসছে। বাতাসের গতিও বাড়ছে।’

‘আমাকে হুইল দিন,’ বলল রানা। ‘আপনি বরং নীচে গিয়ে আইরিনকে সাহায্য করুন।’

পরবর্তী আধঘণ্টায় আবহাওয়া আরও খারাপ হলো। দৃষ্টিসীমা দ্রুত কমছে। অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে মোটর ক্রুযার, খানিক পর পর একটা করে ঢেউ উঠে আসছে ডেকে। পানি সেচে কুলানো যাচ্ছে না, ভরে উঠছে বোট।

আরও দশ মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে হুইলহাউসে ঢুকল আইরিন। ‘কারও কিছু করার নেই!’ নিঃশব্দে কাঁদছে সে। ‘বোট ডুবছে।’

নীচে কী ঘটছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। সত্যিই, এখন আর কারও কিছু করার নেই। ‘লাইফ বোট নামিয়ে রেডি হও তোমরা। আমি আসছি।’

দুই মিনিট পর ডিঙ্গিটা নামানো হলো সাগরে। ওটার পিছনে বাবাকে নিয়ে বসল আইরিন। লেমনস্কি ও রানা একটা করে বৈঠা নিয়ে সামনের দিকে থাকল। সাগর ইতোমধ্যে তামান্নার ডেক লেভেলে উঠে এসেছে।

বৈঠা চালিয়ে ওটার কাছ থেকে দূরে সরে আসছে ওরা।

প্রথমে পুরনো মোটর ক্রুযারের বো ডুব দিল পানিতে। কয়েক মুহূর্ত ওভাবে স্থির থাকার পর সাবলীল ভঙ্গিতে বাকি অংশ নেমে গেল পানির নীচে। রানার বৈঠা চালাবার গতি আরও বাড়ল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অন্ধকার সাগরে, চেষ্টা করছে মোল্লা বখতিয়ার আর আইরিনের দিকে না তাকাতে।

তারপর এক সময় ভোরের আলো ফুটল। আকাশ হয়ে উঠল নীল। দিগন্তে চলে এল সূর্য। উত্তর-পশ্চিমে ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

দু'ঘণ্টা পর খিজির হায়াতের চার্টার বোট দেখতে পেয়ে তুলে নিল ওদেরকে। টিউনা ধরবার জন্য স্যালামেস বন্দর থেকে এদিকে এসেছে তারা। খিজির হায়াতের সঙ্গে সহকারী হিসেবে একজন নিগ্রো ডেকহ্যান্ড রয়েছে।

জেটি ধরে ইয়ট ফরচুনার দিকে এগোবার সময় রানা দেখল, স্টার্নে দাঁড়িয়ে একটা রশিকে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে কাফ্রি সরদার, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আকারে-প্রকারে তার সঙ্গে মানানসই এক মহিলা, সম্ভবত প্রেগন্যান্ট। হুইলহাউসের বাইরের হুকে ঝোলাল সেটা, পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখে হাত নাড়ল একটা লঞ্চের উদ্দেশে, তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বাকি সবাই আসছে কি না দেখে নিল রানা, তারপর লাফ দিয়ে ইয়টের ডেকে নামল, ধীর পায়ে ঢুকে পড়ল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কেবিনে। গ্যালিতে রয়েছে কাফ্রি সরদার, সঙ্গে তারই মত সেই মহিলা কুস্তিগির। সেদিক থেকে ভেসে আসা কফির গন্ধ পাচ্ছে ও।

‘আরও চার কাপ বেশি বানান,’ বলল রানা। ‘অতিথি আসছেন।’ গদি আঁটা সিটে বসে পড়ল ও।

গ্যালি থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রূ কোঁচকাল প্রকাণ্ডদেহী কাফ্রি সরদার। ‘মিস্টার রানা, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!’

‘ইজরায়েল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি, সেটাই তো ভাগ্য।’

চোখ বড় করল কাফ্রি সরদার। ‘তার মানে আবুযারে গিয়েছিলেন আপনি? রব্বানির খোঁজ পেয়েছেন?’

‘পাওয়া না পাওয়া সমান। তবে দেখা গেল ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে – কখন পৌঁছাব তার জন্যে ওত পেতে ছিল।’

হতভম্ব দেখাল সরদারকে। ‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব? শুধু আমরা তিনজন জানতাম ওখানে আপনি যাচ্ছেন। আমি ইজরায়েলি স্পাই নই। মিস্টার মেনদেরেসও তা হতে পারেন না। বাকি থাকলেন কেয়ার ফ্রির মালিক হের মোরেল...’

‘সেই-ই!’

‘গড, ওহ্ গড!’

‘সরদার, এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ,’ বলল রানা। ‘আপনি আমাকে বলেছিলেন ট্যুরিস্টের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আপনার ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না, ইয়টটা বেচে দেবেন। একটা দামও বলেছিলেন। আপনি কি এখনও তাই ভাবছেন?’

‘ভাবছি না মানে! আমি একা না, আমার বউও তা-ই ভাবছে। এমনকী দেশ থেকে চলে এসেছে আমাকে নিতে।’ ইঙ্গিতে পিছনে দাঁড়ানো অর্ধাঙ্গিনীকে দেখাল। ‘কিন্তু খদ্দের পাই কোথায়।’

রানা বলল, ‘আপনার ফরচুনা আমি কিনে নিলাম।’

জবাবে সরদার কিছু বলবার আগে কম্প্যানিওনওয়েতে পায়ের আওয়াজ হলো, এক মুহূর্ত পর কেবিনে ঢুকলেন কর্নেল লেমনস্কি, তার পিছু নিয়ে আইরিন ও মোল্লা বখতিয়ার।

পরিচয় ও কুশল বিনিময় হলো। স্ত্রী মারিয়ার সঙ্গেও সবার পরিচয় করিয়ে দিল সরদার। তারপর তাড়াতাড়ি গ্যালিতে ফিরে গেল দুজন।

ক্র্যাকার ও কফি খাওয়ার পর পাশের কেবিনে ঘুমাতে চলে গেল বুড়ো বখতিয়ার। আইরিন গেল শাওয়ার সারতে।

দ্বিতীয় মগে চুমুক দিয়ে সরদারকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মেনদেরেস এখন কোথায়?'

'এখনও কেয়ার ফ্রিতেই আছেন তিনি,' বলল সরদার।

'সার্জেন্ট নেকমেতিন শহরে আছেন?'

মাথা নাড়ল সরদার। 'তিনি তাঁর দুই কনস্টেবলকে নিয়ে দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে, ককাইনা-য় গেছেন। কাল রাতে কী যেন একটা হয়েছে ওখানে। বলে গেছেন আজই ফিরে আসবেন।'

মগটা খালি করে উঠল রানা। 'আমি যাই, মেনদেরেসের সঙ্গে কথা বলি।' ম্যাপ-ড্রয়ারের তালা খুলে ভিতর থেকে দুটো অস্ত্র বের করল। একটা ল্যুগার অটোমেটিক, অপরটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ওগুলো, তারপর দ্বিতীয়টা রেখে দিল দেরাজে।

'ভাবছেন বিপদ হবে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল লেমনস্কি।

শোলডার হোলস্টারে গুঁজে রাখল রানা অস্ত্রটা। 'হতে পারে।'

এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখছিল আইরিন, দ্বিতীয় মগটায় একবারও চুমুক দেয়নি। হঠাৎ সে জানতে চাইল, 'আর আমরা, ভাইয়া?'

'তোমরা আপাতত এখানেই থাকো,' বলল রানা। 'কেয়ার ফ্রিতে এখনও আমার একটা কামরা আছে, আমি আর কর্নেল ওখানে থাকব।'

'আপনার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না?'

'হবে। হাতের কাজটা সেরে এখান থেকে আমার জিনিস-পত্র

নিতে ফিরে আসব আমি, তখন তোমার জন্যে কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে আসব,' বলল রানা। 'তারপর এই ইয়ট নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে তোমরা। অবশ্য, যদি চাও, কাফ্রি সরদার তোমাদেরকে হার্মোনি বন্দরে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে একটা বোট ভাড়া নিয়ে ফিরে আসবে সে।'

আইরিনের কপালে সরু রেখা ফুটল। 'আপনার কথা বুঝলাম না, ভাইয়া।'

'ওহ্-হো, বলিনি বুঝি? এই ইয়টটা কিনে নিয়েছি আমি তোমাদের জন্যে,' বলল রানা। 'এটা এখন তোমাদের। একটা উপহার দিয়ে ঋণের বোঝা কিছুটা কমাবার চেষ্টা আরকী।'

টলে উঠছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি টেবিলের কিনারাটা চেপে ধরল আইরিন। লেমনস্কির পিঠে মৃদু খোঁচা মারল রানা, বলল, 'চলুন।'

'না, ভাইয়া,' প্রতিবাদ করল আইরিন। 'না, এ হয় না!'

রানা বলল, 'কোনও তর্ক নয়, আইরিন। ভাইয়ার সঙ্গে তর্ক করতে নেই, আমি যা বলেছি তাই হবে।' লেমনস্কিকে নিয়ে ইয়ট থেকে নেমে গেল ও। দরজায় দাঁড়িয়ে ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আইরিন, দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

# পনেরো

বিচ ক্লাব কেয়ার ফ্রির টেরেসে ভিড় লেগে গেছে ট্যুরিস্টের, খোলা জায়গায় বসে ডিনার খাচ্ছে তারা। নীচের লনে একটা আফ্রিকান

কাফ্রি ব্যান্ড আধুনিক ও প্রাচীন মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট বাজিয়ে গান করছে।

রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে রানা, দেখতে পেয়ে হাসল গ্রিক মেয়েটা। 'ভাল আছেন, মিস্টার রানা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের সামনে থামল রানা। 'আমার স্যুইটের চাবিটা।'

'ইয়েস, সার।' বোর্ড থেকে খুলে চাবিটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। 'এখনই ওপরে যাবেন?'

'হ্যাঁ। হের মোরেল আশপাশে আছেন?'

'বোধহয় অফিসে। ফোন করে খোঁজ নেব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, থাক। তাঁর সঙ্গে পরে একসময় দেখা করব আমি। এখন আমার শাওয়ার দরকার।'

চারতলায় উঠে এসে স্যুইটে ঢুকল রানা, পিছু নিয়ে লেমনস্কিও। বেডরুমের জানালায় পরদা টানা, বিছানাটা নতুন করে তৈরি।

'বেডরুমটা আপনি ব্যবহার করুন,' রুশ কর্নেলকে বলল ও, হাত তুলে একটা দরজা দেখাল। 'বাথরুম। পরিষ্কার কাপড় পাবেন ওয়ার্ড্রোবে।'

'আপনি এখনই মিস্টার মেনদেরেসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

মেনদেরেসের স্যুইটটা দোতলায়। দরজার সামনে থেমে নক করল রানা। দরজা খোলা, বুঝতে পেরে কবাট পুরোপুরি খুলে ভিতরে ঢুকল।

'টেবিলে রাখো, হে। আমি এখনই আসছি,' টেরেস থেকে বললেন আদনান মেনদেরেস।

অপেক্ষা করছে রানা, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। খানিক পর টেরেস থেকে সিটিং রুমে ঢুকলেন মেনদেরেস, কোমরে শুধু একটা

বড়সড় তোয়ালে জড়ানো, একহাতে একটা বই, অপর হাতে সানগ্লাস। রানাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ‘চমকে দিয়েছেন, ইয়াং ম্যান! আমি ভেবেছি রুম সার্ভিস।’

দরজায় আবার নক হলো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল রানা। দরজা খোলার ও কথাবার্তার আওয়াজ ঢুকল কানে, তারপর আবার বন্ধ হলো কবাট। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল টেবিলে একটা ট্রে নামাচ্ছেন মেনদেরেস। তাতে হুইস্কি, বরফ ইত্যাদি রয়েছে।

‘হেলপ ইওরসেলফ,’ বলে ইঙ্গিতে রানাকে ট্রেটা দেখিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড্রোব থেকে কাপড় নিয়ে বেডরূমে ঢুকলেন সিরিয়ান এজেন্ট। একটু পর কিচেন হয়ে ফিরে এলেন, আরেকটা গ্লাস নিয়ে।

সোফায় বসে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলেন মেনদেরেস। ‘দেখে মনে হচ্ছে খুব ধকল গেছে আপনার ওপর দিয়ে। আবুযার বন্দরে যাবার বোট কি শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন আপনি?’

ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল রানা, তারপর কাছাকাছি সরে এসে ফিসফিস করল, ‘এখানে ছারপোকা নেই তো আবার?’

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন মেনদেরেস, মনে মনে ভাবছেন – আরে, এই ভদ্রলোক জানেন নাকি যে আমি একজন স্পাই? ‘না, নেই। কিন্তু কেন ভাবছেন ছারপোকা থাকতে পারে?’

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা।

‘না, বোট পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আবুযার থেকে ঘুরে এলাম।’ এক ঢোক হুইস্কি খেল রানা। ‘বৃথাই সময় নষ্ট। যে লোককে আমার খোঁজা উচিত ছিল সে আসলে এখানে, স্যালামেস বন্দরেই রয়েছে।’

ভ্রূ কোঁচকালেন মেনদেরেস। ‘কী বলতে চাইছেন, মিস্টার রানা? আহমেদ রব্বানি এখানে?’

মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। দু-মুখো সাপ ছিল লোকটা। গিয়ে দেখি, আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ওখানকার চিফ, কর্নেল ইয়েলিচ।'

'কী করে জানল সে যে আপনি যাচ্ছেন ওখানে? আহমেদ–'

'না, জিমি মোরেল জানিয়েছে। এ হলো তিনমুখো সাপ! আপনার পরিচয়ও ওদের জানা।'

'তাই বলল ওরা? আপনাকে বলেছে ওরা যে আমি–'

'সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সে আছেন, এ-কথা ওদের মুখে শুনে জানতে হবে কেন? এ তো আমি অনেক আগে থেকেই জানি।'

'কী করে!' একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন মেনদেরেস।

'আমিও তো কোনও একটা ইন্টেলিজেন্সের লোক হতে পারি, তা-ই না?' বলল রানা হাসিমুখে।

হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলালেন তিনি। তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনিই কি সেই লিজেন্ডারি বাংলাদেশী এজেন্ট, মাসুদ রানা? নিশ্চয়ই তা-ই! এখন মনে পড়ছে, কেন চেনা চেনা লাগছিল; আমি তো দেখেছি আপনার ছবি!' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি রানার দিকে, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মত একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয়–'

'হাতে কিন্তু সময় খুবই কম,' হাতটা ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল রানা। 'মোরেলকে ধরতে হবে।'

সোফা ছেড়ে ওয়ার্ড্রোবের সামনে চলে গেলেন মেনদেরেস, কাপড়ের নীচ থেকে পিস্তল ও শোলডার হোলস্টার বের করে কোট খুলতে শুরু করলেন। 'আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, আপনি প্লিজ একটু খুলে বলুন। সবটুকু, মাইন্ড ইট। এসব ঘটনা পরম্পরার অন্য রকম তাৎপর্যও থাকতে পারে, আপনি হয়তো জানেন না।'

কিছু বাদ না দিয়ে সব বলে গেল রানা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট বাঁধলেন মেনদেরেস,

কোটটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! সত্যিই রুশ কর্নেল নিকিতা লেমনস্কিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আপনি? এই মুহূর্তে তিনি আপনার স্যুইটে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তাঁর কথা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। মোরেল সম্পর্কে বলুন।'

'এটা নতুন কিছু নয়,' বললেন মেনদেরেস। 'জার্মানিতে ছিল, এখানে এসে সেটেল্‌ড্‌ হয়েছে, এমন ইহুদি অনেকেই মোসাদে নাম লিখিয়েছে। তবে মোরেলকে আমার ছোট একটা ঘুঁটি বলেই মনে হচ্ছে, বড়জোর ইনফরমার।'

হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'মোরেলকে জেরা করলেই জানা যাবে সব।'

'বেশ, চলুন।'

'কাজটা আমি একা করতে চাই,' বলল রানা। 'যাবার পথে কর্নেল লেমনস্কির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালেন মেনদেরেস। তাকে নিয়ে নিজের স্যুইটে ফিরে এল রানা। লেমনস্কির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল ও, তারপর আর সময় নষ্ট না করে নীচতলায় নেমে এল।

দুপুর না পেরুতেই ভিড় লেগে গেছে ক্যাসিনোয়। মোরেলের চেম্বারের দিকে এগোচ্ছে ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ক্যাসিনোর গ্রিক ম্যানেজার এগিয়ে আসছে ওর দিকে। 'কাউকে খুঁজছেন, মিস্টার রানা?'

'কেন, দেখতে পাচ্ছেন না কোথায় যাচ্ছি আমি?' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

'দুঃখিত, সার। হের মোরেল এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত। বলে রেখেছেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।'

'সরে দাঁড়ান!' বলে কাঁধের ধাক্কায় লোকটাকে সরিয়ে দিল রানা, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বার-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে মোরেল।

উঁচু টুলে বসে রয়েছে ছয় ফুট লম্বা এক তরুণ, তার চওড়া কাঁধে টান টান হয়ে আছে গ্যাবার্ডিনের জ্যাকেট। মুখে মাংসের অনেকগুলো ভাঁজ ও বাম চোখের নীচে শুকনো ক্ষতটা তার চেহারায় বিপজ্জনক একটা ভাব এনে দিয়েছে। সোনালি চুল কোঁকড়ানো।

নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, এর উপর চোখ রাখতে হবে।

পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল রানা। ছোট্ট, উত্তেজক কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল।

ধীরে ধীরে টুল ছেড়ে দাঁড়াল তরুণ, জ্যাকেটের বোতাম খুলছে।

'আরে, হের রানা যে!' হঠাৎ যেন আবেগে অধীর হয়ে উঠল মোরেল। 'দারুণ সারপ্রাইয তো!'

'ইউ বাস্টার্ড!'

মোরেলের চোখে-মুখে অকৃত্রিম সতর্কতা ফুটে উঠল। 'আপনার মেজাজ ও ভাষা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে, হের রানা। খুব ভাল হয় আপনি যদি ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে আসেন।'

সামনে পড়ায় ছোট একটা কফি টেবিল লাথি দিয়ে সরাল রানা। 'কোনও চালাকি নয়, মোরেল,' বলল ও। 'মাথার ওপর হাত তুলে কাউন্টারের এপারে বেরিয়ে এসো।'

'লোবাক,' মাথার উপর হাত তোলার সময় বিড়বিড় করল মোরেল, বার ঘুরে বেরিয়ে আসছে সে। 'কিল হিম!'

তৈরি ছিল রানা।

চোখের পলক ফেলবারও আগে দুজনের হাতেই একটা করে আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে এল।

ডানদিকে ডাইভ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গুলি করল লোবাক। রানা গুলি করল ডাইভ দেওয়ার পর, উড়ন্ত অবস্থায়।

এক পলক দেরি করে ফেলায় একজনের খুলি উড়ে গেল।

মোরেলের পায়ের সামনে দড়াম করে আছাড় খেল সে, কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। তার ছোঁড়া বুলেট শুধু সিলিঙের ঝাড়বাতিটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

লাথি দিয়ে সামনে থেকে লাশটা সরাল মোরেল। হাসছে। 'ওয়েল ডান, হের রানা। যেমন শোনা যায়, আ রিয়েল হিরো। দ্যাট ওয়ায পিওর রিফ্লেক্স অ্যাকশন। আই কংগ্রাচুলেট ইউ।'

এই সময় দরজার বাইরে হইচই শোনা গেল, গুলির শব্দ শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকজন।

'কিছু না, কেউ আহত হয়নি,' তাদেরকে আশ্বস্ত করল মোরেল। 'আমরা জানালা দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করছি।'

ঝুঁকে লোবাকের পিস্তলটা তুলে পকেটে ভরল রানা। তারপর হাতটা লম্বা করে মোরেলের কপালে ল্যুগারের মাজলটা চেপে ধরল। 'ভাঁড়ামি করে আর কোনও লাভ নেই, মোরেল। তুমি ধরা পড়ে গেছ। রেডিওর অপরপ্রান্তে কর্নেল ইয়েলিচকে তুমি আর পাচ্ছ না। তাকে আমি শেষ করেই এসেছি।'

'পিস্তলটা সরান, হের রানা।' শান্ত থাকতে চেষ্টা করছে মোরেল। 'তারপর বলুন কী হয়েছে।'

রানার হাতের পিস্তল একচুল নড়ল না। 'তুর্কি সাইপ্রাসে মোসাদের একজন রেসিডেন্ট এজেন্ট তুমি। তোমার পাঠানো মেসেজ পেয়ে আবুযারে আমার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা,' বলল ও। 'তা ছাড়া, ফিলিস্তিনি পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর মোসাদ্দেক মাসলানকে খুন করার প্ল্যানটাও তোমারই ছিল। সুরাইয়া যে ওই প্লেনে থাকবে, তা-ও তুমি জানতে ।'

কপাল থেকে পিস্তলের মাজল সরিয়ে নিয়ে রানাকে এক পা পিছাতে দেখে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল মোরেলের চোখ। 'কী করছেন, হের রানা?'

হাতের পিস্তল মোরেলের নাভি বরাবর তাক করল রানা। 'তোমার পেটে গুলি করব। প্রচুর সময় নিয়ে মরবে, তার আগে

গড়গড় করে সব বলেও যাবে।'

'প্লিজ, হের রানা, প্লিজ!' মোরেলের চোখে-মুখে মরিয়া একটা ভাব ফুটল। 'মেরির কিরে, আমি মোসাদের কেউ নই। আমি ইহুদিও নই। বিশ্বাস করুন, মোসাদ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

'কী করছে?'

নরম সুরে নিজের কাহিনিটা শোনাল জিমি মোরেল।

তার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্লিনে। প্যারিসের একটা ব্যাঙ্কে তার নামে বেশ মোটা টাকা জমা রেখে গিয়েছিল বাবা। বয়স হবার পর সেই টাকা তুলেই এখানে ব্যবসাটা শুরু করে মোরেল। এত বছর পর মোসাদ কীভাবে যেন জেনে ফেলে যুদ্ধের সময় তার বাবা নাৎসি পার্টির সদস্য ছিল, ইহুদিদের ওপর টরচার করেছে। জানার পর মোরেলকে খুঁজে বের করে, প্রস্তাব দেয় তাদের হয়ে ইনফরমারের কাজ করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কের সব টাকা ফেরত দিতে হবে।

মোরেল থামতে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'তার মানে মূল ভূমিকা সব সময় টাকারই, কেমন? বাপের চুরি করা টাকা দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছ, সেটা ধরে রাখার জন্যে দু-পাঁচজন নিরীহ মানুষকে খুন করতেও তোমার বাধছে না। তা হলে আমিই বা কেন ঠকি? আমার স্যুইটে এমন একজন রয়েছে যার বিনিময়ে আমিও প্রচুর টাকা কামাতে পারি। তুমিই বলো, পারি না?'

ইতস্তত করছে মোরেল। ভাব দেখে মনে হলো বলতে যাচ্ছে রানার কথা বোঝেনি সে। কিন্তু না, অবশেষে সবই তার জানা বলে স্বীকার করে নিল। 'ঠিক আছে, হ্যাঁ, পারেন।'

'আমি ধরে নিয়েছি সবই তুমি জানো,' বলল রানা। 'আমি কী করব বলছি। কর্নেল নিকিতা লেমনস্কিকে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি আমি। আমাকে বিশ্বাস করেন তিনি...'

উৎসাহে চকচক করে উঠল মোরেলের চোখ দুটো। 'বুঝতে

পারছি, আপনি একটা চুক্তিতে আসতে চাইছেন, হের রানা।'

'হ্যাঁ।'

'কত?' সরাসরি জানতে চাইল মোরেল।

'পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একদম পানির দর।'

'এই এলাকার টপ মোসাদ বস্-এর সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল মোরেল।

'কে সে?' জানতে চাইল রানা।

'কর্নেল মারা যাবার পর একজন ক্যাপটেন।'

'আমি দেরি করতে চাই না। কখন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মোরেল। 'ঠিক আছে। আমরা রওনা হব সন্ধের পর।'

'কত দূরে?'

'কাছেই, মাত্র দু'ঘণ্টার পথ।'

'গ্রিক সাইপ্রাসের কুকটিয়া-র কাছাকাছি কোনও দ্বীপে, তাই না?'

হাসল মোরেল। 'হের রানা, আপনি কি আমাকে গাধা মনে করেন?'

'না, ঠিক তা নয়।'

'শুনুন। আমরা ফরচুনা নিয়ে যাব। রাত আটটার দিকে জেটিতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তবে সরদার ও মেনদেরেসের সঙ্গে এখানে, পুলিশ স্টেশনে থাকবেন কর্নেল লেমনস্কি। তিনি আমার বিমা, ওখানে আমার সঙ্গে তোমরা যাতে গোলমাল করতে না পার।'

'তাঁর সঙ্গে সরদারকে রেখে গেলে ক্রু হিসেবে ইয়টে কে থাকবে? আমার বোটম্যান কালামাই-কে নিতে হয় তা হলে,' বলল মোরেল।

কালামাইকে দেখেছে রানা – হাবাগোবা টাইপের খ্রিশ্চান

গ্রিক, ব্যায়ামপুষ্ট শরীর। মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল ও।

'মিস্টার মেনদেরেসের খবর কী? তিনি কি আশপাশে আছেন?'

'জানি কী জানতে চাইছ,' দরজার কাছে পৌঁছে বলল রানা। 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বলেছি রব্বানি মারা গেছে, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি আমি ভাগ্যগুণে।'

'আমার কথা তাঁকে আপনি বলেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তবে মনে রেখো, বলতে পারি।'

'এক মিনিট, হের রানা,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বিচলিত হয়ে উঠল মোরেল। 'লাশটার কী হবে?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা।'

স্যুইটে ফিরে এল রানা। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাচ্ছেন কর্নেল লেমনস্কি। মেনদেরেসকে দেখা গেল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

'কী খবর, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করলেন লেমনস্কি।

'মোরেলের বডিগার্ড টার্গেট মিস করেছে,' বলল রানা। 'আমি করিনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী,' বলল রানা। 'আপনাকে বিক্রি করতে রাজি হয়ে এলাম।'

'কী করতে রাজি হয়ে এলেন?' ভ্রূ কোঁচকালেন মেনদেরেস।

'মোরেলের বন্ধুদের সঙ্গে, অর্থাৎ মোসাদের সঙ্গে আমি একটা চুক্তিতে আসছি। ওই ব্যাটার সঙ্গে আটটায় জেটিতে আমার দেখা হবে। এই এলাকায় ওদের একটা হেডকোয়ার্টার আছে, ইয়ট নিয়ে সেখানে যাচ্ছি আমরা।'

'জায়গাটা কোথায় বলেছে সে?'

গায়ের শার্ট খোলার সময় মাথা নাড়ল রানা। 'বলেছে,

দু'ঘণ্টার পথ। সাইপ্রাস ও ইজরায়েলের মাঝামাঝি কোথাও। ঠিক কোথায়, পরিষ্কার জানার কোনও উপায় নেই।'

'আর কে যাচ্ছে আপনার সঙ্গে?'

'কেউ না, আমি আর মোরেল। হুইল ধরার জন্যে অবশ্য ওর বোটম্যান কালামাইকেও নিতে হচ্ছে।'

'কিন্তু ঝুঁকিটা মারাত্মক হয়ে যাচ্ছে না, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করলেন মেনদেরেস। 'ওই তিনমুখো সাপের সঙ্গে কোথাও যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'শাওয়ারটা সেরেই বেরুব আমি,' বাথরুমের দরজার কাছে পৌঁছে বলল রানা। 'থানায় যাব, ওখান থেকে ফরচুনায়। ইয়ট থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে রাত আটটায় মোরেলের সঙ্গে যাব সেই দ্বীপে। সুরাইয়ার পরিণতির শেষ দেখতে হবে আমাকে। আমি জানি, আপনার জরুরি কিছু কাজ আছে। অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হবে আপনাকে আগামী দুটো দিন। তারপরেও, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কর্নেল লেমনস্কির নিরাপত্তার দিকে আপনি একটু খেয়াল রাখলে খুশি হব।'

মাথা ঝাঁকালেন মেনদেরেস। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার এজেন্ট থাকবে ওঁর সঙ্গে। একটু পরেই ডেকে পাঠাব আমি তাকে।'

আইরিনের জন্য সুন্দর একটা ড্রেস কিনে ফরচুনায় ফিরছে রানা।

# ষোলো

ফরচুনার কেবিনে একটা চেয়ারে মোরেলের অপেক্ষায় বসে বসে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে রানা।

ওর অনুরোধে লেমনস্কির সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে থাকতে রাজি হয়েছেন আদনান মেনদেরেস। পোয়াতি মারিয়া একটু অসুস্থ বোধ করছিল, রানাকে ডিনার খাওয়ানোর পর এখুনি আসছি বলে স্ত্রীকে আতাতুর্ক ক্লিনিকে ভর্তি করতে নিয়ে গেছে সরদার। ওদের সঙ্গে আইরিন ও মোল্লা বখতিয়ারও গেছে।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলতেই হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে ছয়টা বাজে। মনে পড়ল, আটটায় মোরেলের সঙ্গে রওনা হওয়ার কথা। আশ্চর্য, কোথায় কাফ্রি সরদার? ওর ঘুম কেউ ভাঙায়নি কেন?

তারপর ভাবল, নাকি তারা ফেরেইনি?

নাম ধরে ডেকে কারও কোনও সাড়া পেল না রানা। ডেকে বেরিয়ে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও, কর্নেল লেমনস্কির নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনও চিন্তা নেই, মেনদেরেস সে দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কি এখনই থানায় একবার যাওয়া উচিত ওর?

কাফ্রি সরদার ও তার স্ত্রীর কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছে ওর। কথা দিয়ে না রাখবার লোক নয় সরদার। তবে কি মারিয়ার পেইন-টেইন উঠেছে?

বিচ ক্লাব কেয়ার ফ্রিতে ফিরে এল রানা। রিসেপশন ডেস্ককে পাশ কাটিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোবার সময় লক্ষ করল, আদনান মেনদেরেসের চাবিটা এখনও বোর্ডে ঝুলছে।

নিজের স্যুইটে ঢুকে রানা দেখল প্রতিটি কামরায় আলো জ্বলছে, কিন্তু লেমনস্কি ও মেনদেরেস কোথাও নেই। বিছানার চাদর নিভাঁজ করে বিছানো রয়েছে, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলোও খোলা। কপালে চিন্তার রেখা ফুটল।

নীচে নেমে এসে রিসেপশনে থামল রানা। ডেস্কে ডিউটি দিচ্ছে কালো একটা মেয়ে। 'যে ভদ্রলোক আমার স্যুইট শেয়ার

করছিলেন,' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে দেখেছেন তাকে?'

'আধঘণ্টা আগে বাইরে বেরিয়েছেন তিনি, সার।'

রানার মাথার ভিতর অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। 'তিনি কি একা ছিলেন?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না, সার। তাঁর সঙ্গে মিস্টার আদনান মেনদেরেস ছিলেন – ওই যে, সিরিয়ান ভদ্রলোক, একশো চার নম্বর স্যুইটে থাকেন।'

ঘুরল রানা, বার-এ চলে এসে ওয়েটারকে একটা বিয়ার দিতে বলল। ভাবছে, ওর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে লেমনস্কিকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে চলে গেছেন মেনদেরেস? অসম্ভব নয়। গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাতঘড়ি দেখল ও।

সাতটা পঁচিশ। চোখ তুলতেই দেখতে পেল ওর দিকে হেঁটে আসছে জিমি মোরেল, হাতে একটা গ্লাস। মুখভর্তি হাসি ও সাদা ডিনার জ্যাকেটে ঝলমলে লাগছে তাকে। 'আপনি তৈরি তো, হের রানা?'

'হ্যাঁ, তৈরি। তুমি?'

'আমার দু'একটা কাজ আছে এখানে, একটু হয়তো দেরি হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে জেটিতে দেখা করব।'

একগাল হাসি নিয়ে চলে গেল মোরেল।

আরেকটা বিয়ার নিল রানা। মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। মোরেলের হাসি ওকে যেন ব্যঙ্গ করছিল।

দু'একটা বোটে আলো থাকলেও, গোটা জেটি খালি পড়ে আছে। ফরচুনার দিকে এগোবার সময় টেলিভিশনের আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, আল জাজিরা থেকে ফিলিস্তিনি দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে।

ইয়টে উঠে ডেক ধরে এগোল রানা, থামল কম্প্যানিওনওয়েের ছায়ায়। অস্বস্তি বোধ করছে ও, কারণটা পরিষ্কার নয়।

কম্প্যানিওনওয়ে বেয়ে নামতে যাবে, পিছন থেকে কেউ একজন ওর শিরদাঁড়ায় পা রেখে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল।

ধাপগুলোর উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে রানা, নীচের দরজা খুলে যাওয়ায় শরীরটা ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতরে।

শরীরটা স্থির হওয়ার আগেই কোমরের বেল্টে পৌঁছে গেল রানার হাত। কঠিন সুরে বলল কেউ, 'সাবধান, রানা। ওখান থেকে হাত সরাও, তা না হলে গুলি করছি।'

দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুট পরা লম্বা-চওড়া গ্রিক কালামাই, হাতে সাব-মেশিনগান, চোখে-মুখে বোকা বোকা ভাব। আইরিন, তার বাবা মোল্লা বখতিয়ার ও কাফ্রি সরদার বসেছে সেলুনের একধারে, আরেক ধারে বসেছেন নিকিতা লেমনস্কি ও আদনান মেনদেরেস। সরদারের চেহারায় অনেকগুলো জখমের দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সহজে আত্মসমর্পণ করেনি সে। মারিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গ্যালিতে ঢোকার মুখে উযি মেশিন-পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন নিগ্রো, গায়ে লাল-সাদা ডোরাকাটা জার্সি।

মাথার উপর হাত তুলে সাবধানেই দাঁড়াল রানা, চোখে-মুখে হতচকিত একটা ভাব। দক্ষ হাতে ওকে সার্চ করল কালামাই, ল্যুগারটা বের করে নিয়ে নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল, তারপর পিছিয়ে নাগালের বাইরে সরে গেল।

ঘুরল রানা। দেখল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জিমি মোরেল। 'এবার তা হলে আমরা রওনা দিতে পারি, কি বলেন, হের রানা?' হাসছে সে।

'এ-সবের মানে কি?' জানতে চাইল রানা, চোখে-মুখে বিহ্বল একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে।

হেসে উঠল মোরেল। 'মানে হলো আপনি বুদ্ধু, আর আমি বুদ্ধিমান।'

আধ ঘণ্টা হলো রওনা হয়েছে ফরচুনা। সাগরের চারদিকে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখছে না রানা। আপাতত ওর কিছু করবার নেই। হুইলহাউসে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। কোণে হেলান দিয়ে রয়েছে নিগ্রো গার্ড, বাগিয়ে ধরে আছে সাব-মেশিনগান। তৃতীয় গার্ডকে গ্রিক বলে মনে হলো, স্টার্নে গুড়ি মেরে বসে আছে, হাতে কালাশনিকভ।

একটু পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মোরেল। 'তুমি বাইরে অপেক্ষা করতে পার, ব্রাউনি। হের রানা বোকার মত কিছু করবেন বলে আমি মনে করি না।'

কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল নিগ্রো।

'কালামাইকে নির্দেশ দেওয়া আছে,' রানাকে বলল মোরেল, 'কেউ কোনও গোলমাল শুরু করলেই গুলি করবে সে। কেবিনের মত বদ্ধ একটা জায়গায় এক পশলা গুলি কতটা ক্ষতি করতে পারে, আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন।'

'তুমি এরকম বেঈমানী করবে জানলে...' রানার বিস্ময়ের ঘোর এখনও যেন কাটছে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল মোরেল। 'সত্যি কথা বলতে কী, আপনি যে এতটা কাঁচা কাজ করবেন, আমিও তা আশা করিনি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল রানা।

চার্ট টেবিলের উপর ঝুঁকল মোরেল। 'লেসবস আইল্যান্ড, কারপস্ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দশ মাইল দূরে। চেনেন?'

শ্রাগ করল রানা।

'দু-একবার মনে হয় পাশ কাটিয়ে গেছি,' বলল ও। 'শুনেছি কোনও এক আমেরিকান মিলিওনেয়ার ওটার মালিক।'

'সেটা বছরখানেক আগের কথা,' হাসল মোরেল। 'মোসাদ ওটা বেনামে কিনে নিয়েছে। তবে দ্বীপের লোকজন এত কিছু জানে না।'

উত্তর-পশ্চিমে মন্থর বাতাস বইছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা না গেলেও আকাশটাকে প্রাণবন্ত লাগছে, মিটমিট করছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র।

'বুঝলেন, হের রানা,' বড় করে একটা শ্বাস টেনে বলল মোরেল, 'ভাবতে বড় ভাল লাগে এরকম একটা রাতে বেঁচে আছি। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করি।'

'মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে,' বলল রানা, 'তুমিও হয়তো আমাদের মত একজন মানুষ।'

'আমাদের ব্যাপারটার মধ্যে আসলে ব্যক্তিগত কিছু নেই,' বলল মোরেল। 'এসপিওনাজ জগতের জীবিত কিংবদন্তি মাসুদ রানা; নিজের পেশায় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও তিনি একটা ভুল করেছেন। কাজেই তাঁকে খেসারত দিতে হচ্ছে। আর কিছু নয়।'

'সুরাইয়া আর রাহি সামদানির কথা ভুলে যাচ্ছ?'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল মোরেল। 'তিক্ত কর্তব্য। জানতাম পরে হয়তো অনুতাপ হবে। তা ছাড়া, সিদ্ধান্তটা আমার ছিল না।'

'হঠাৎ কীভাবে আজ শয়তানি বুদ্ধিটা ঢুকল তোমার মাথায়?'

অন্ধকারে ঝিক করে উঠল মোরেলের দাঁত। 'হের মেনদেরেসের লাইটারটা আমরা বদলে দিয়েছিলাম। হুবহু একইরকম দেখতে, তবে আমাদেরটায় মাইক্রোফোন ছিল।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'আপনি ওঁদেরকে যা যা বলেছেন, সবই আমি শুনেছি। যদি ভেবে থাকেন তার লোকজনকে খবর দেয়া হয়েছে, ঠিক সময়ে এসে আপনাদেরকে উদ্ধার করবে তারা, স্রেফ ভুলে যান। কারণ আপনি নিজের স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর ওঁদের দুজনকে হোটেল ছেড়ে বেরুতেই দেয়া হয়নি।'

'সব বেশ গুছিয়েই করেছ,' বলল রানা।

'আমিও তাই মনে করি। কিছু কি আমার চোখ এড়িয়ে

গেছে?’

‘ওখানে পৌঁছোবার পর কী হবে?’

হাসল মোরেল। ‘ইন্টারেস্টিং কিছু তো হবেই। তবে সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে, হের রানা।’ দরজা খুলে ব্রাউনিকে বলল, ‘আত্রাইকে বলো, তাকে আমার দরকার।’

ব্রাউনি ইশারা করতেই স্টার্ন থেকে তৃতীয় গার্ড আত্রাই চলে এল।

‘ওকে ডাকলে কেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘এখান থেকে সোজা পথ ধরে এগোলেই লেসবস,’ বলল মোরেল। ‘আপাতত হুইলটা ধরতে পারবে আত্রাই। আপনি আপনার গার্ল ফ্রেন্ডের কাছে যেতে পারেন। যখন দরকার হবে ডেকে নেব। ব্রাউনি, হের রানার সঙ্গে যাও।’

‘ওই বাচ্চা মেয়েটা আমার গার্ল ফ্রেন্ড নয়,’ ডেকে বেরিয়ে আসবার সময় কঠিন সুরে বলল রানা।

ডেক থেকে নীচে নেমে দেখল স্যান্ডউইচ ও কফি বানাচ্ছে আইরিন, একপাশে বসে আছে আহত কাফ্রি সরদার। গ্যালিতে ঢোকার মুখে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে কালামাই, একটা আঙুল সাব-মেশিনগানের ট্রিগার গার্ডের ভিতর ঢোকানো।

তাকে গ্রাহ্য না করে মোল্লা বখতিয়ারের পাশে একটা বেঞ্চে বসল রানা। ‘কেমন আছেন আপনি?’

হাসল বুড়ো। ‘আমি সামলে নেব, বাপ। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।’

কাফ্রি সরদারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে লেমনস্কি ও মেনদেরেসের দিকে এগোল রানা। মেনদেরেসের গলার পাশে তাজা ক্ষত দেখল ও। জিজ্ঞেস করল, ‘মনে হচ্ছে অসতর্ক ছিলেন?’

মাথা ঝাঁকাল সিরিয়ান এজেন্ট। ‘এই একবারই।’

লেমনস্কির দিকে তাকাল রানা। ‘আপনার কী খবর? মোরেল কিছু বলেছে?’

‘যা সাধারণত বলা হয়। তার কথামত চললে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। ওদের হয়ে কাজ করলে যা অফার করেছিল, ফ্যাসিলিটি তার দ্বিগুণ করে দেবে।’

‘তারমানে আপনার বাজারদর বেড়ে গেছে।’

‘কিন্তু মুশকিল হলো, আমি বিক্রি হতে রাজি নই।’

গ্যালি থেকে কফি নিয়ে এল আইরিন। পিছনে সরদার, হাতে স্যান্ডউইচ ভর্তি ট্রে। কফির ট্রেটা টেবিলের মাঝখানে নামাবার জন্য ঝুঁকেছে আইরিন, খালি হাতটা দিয়ে তার পায়ের গোছা চেপে ধরল কালামাই।

ঘুরল আইরিন, ঠাস করে একটা চড় কষল কালামাইয়ের গালে। আইরিনের কবজি ধরে ফেলে মোচড়াল কালামাই, একটা হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হতে বাধ্য করল তাকে।

ঝট্ করে সিধে হলেন লেমনস্কি। ‘এই শুয়োর, ছাড়ু ওকে!’ কঠিন সুরে বললেন, মারমুখো ভঙ্গিতে সামনে এগোচ্ছেন।

ধাক্কা দিয়ে আইরিনকে সরিয়ে দিল কালামাই, হাতের সাব-মেশিনগান তাক করল লেমনস্কির বুক লক্ষ্য করে। ‘খবরদার! আর এক পা এগোলেই গুলি করব!’ খেঁকিয়ে উঠল সে।

‘কর্ গুলি!’ বেসুরো গলায় হেসে উঠলেন লেমনস্কি। ‘মোরেল তোকে সেজন্যে পুরস্কার দেবে। আমার লাশটারই তো দাম!’

কপাল কুঁচকে কিছু ভাবল কালামাই। একটা ঢোক গিলল সে। ‘যান, বসে পড়ুন। মুখ বুজে থাকবেন।’

‘যা বলা হচ্ছে শুনুন, মিস্টার,’ কম্প্যানিওনওয়ে থেকে গলা চড়িয়ে বলল ব্রাউনি। ‘তা না হলে মাথা ফাটিয়ে দেব।’ হাতের অস্ত্রটা দেখাল সে।

তাকে গ্রাহ্য করলেন না লেমনস্কি, হাত ধরে তুলে চেয়ারে বসালেন আইরিনকে। ‘আর এরকম হবে না,’ দৃঢ়কণ্ঠে অভয় দিলেন তিনি। ‘কথা দিলাম।’ তারপর মৃদু হাসলেন।

স্যান্ডউইচ ও কফি খাওয়ার পর আইরিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ

ফিসফাস করলেন লেমনস্কি। খানিক পর হাই তুললেন তিনি, উঠে একটা বেঞ্চে চলে এলেন, সরদার ও মোল্লা বখতিয়ারের মাঝখানে বেঞ্চে বসে হেলান দিলেন দেয়ালে, চোখ দুটো বন্ধ।

টেবিলে হাত রেখে তাতে মাথা ঠেকাল আইরিন। দশ মিনিট পর রানা ধারণা করল, আর সবার মত সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সময় চোখ মেলে সরাসরি ওর দিকে তাকাল আইরিন, একবারও পলক ফেলছে না।

হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। আইরিন তার হাত ও মাথা টেবিলের উপর এমনভাবে রেখেছে, তার খালি হাতের নড়াচড়া কালামাই দেখতে পাচ্ছে না। সেই হাতটা দিয়ে ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, ম্যাপ ড্রয়ারটা খুলছে সে।

ঝট করে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের কথাটা মনে পড়ে গেল রানার। পলকের জন্য দেখতে পেল দেরাজ থেকে ওটা বের করে আনছে আইরিন।

পিস্তলটা নিজের কোলের উপর রাখল সে। বোতাম খুলে ড্রেসের সামনেটা ফাঁক করল, ভিতরে লুকাল ওটা, তারপর আবার লাগিয়ে দিল বোতামগুলো।

সেই থেকে একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে আইরিন, পুরোটা সময় ছুরির ফলার মত ঠাণ্ডা একটা ভয় ওর ভিতরে নড়াচড়া করল। ধীরে ধীরে একবার শুধু মাথা নাড়ল ও। এই মুহূর্তে পিস্তল কোনও কাজে আসবে না। কালামাই বা ব্রাউনি সাব-মেশিনগান ওপেন করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কেবিনের ভিতরে রক্তের নদী বয়ে যাবে।

কম্প্যানিওনওয়ের ওদিক থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। দাঁড়াল ব্রাউনি, ইশারা করল রানাকে। 'হের মোরেল আপনাকে ডাকছেন।'

পানির ছিটায় ভিজে গেছে ডেক। রেইলে দাঁড়িয়ে কারপস্ আইল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মোরেল। পায়ের আওয়াজ

পেয়ে ঘুরল।

'আর বেশি দেরি নেই, হের রানা। আপনি যে বোট চালাতে ওস্তাদ, আমার তা জানা আছে, তাই আমি চাই আপনি হুইলের দায়িত্ব নেন। সরদার রাজি হলে আপনাকে এ অনুরোধ করতাম না। সামনের পথটা কঠিন, কালামাই বা আত্রাইয়ের ওপর ভরসা করাটা উচিত হবে না। সময় হলে আমি আপনাকে বলে দেব কোন্‌দিকে যেতে হবে।'

হুইলহাউসে ঢুকল রানা। আত্রাই বেরিয়ে গেল। চাঁদ না থাকলেও দৃষ্টিসীমা খারাপ নয়, ছোটখাট দ্বীপগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাশ কাটাবার সময় কোন্‌টার কী নাম চার্টে চোখ বুলিয়ে দেখে রাখছে রানা।

ছোট একজোড়া দ্বীপের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, নাক বরাবর সামনে উটের পিঠের মত উঁচু হয়ে রয়েছে লেসবস আইল্যান্ড।

ডেক থেকে ভিতরে ঢুকল মোরেল। 'মাঝে মধ্যে সবুজ আলো দেখতে পাবেন। ওটাকে অনুসরণ করবেন, তবে ধীরে ধীরে। চ্যানেলটা খুব সরু।'

স্পিড কমিয়ে আনল রানা। দ্বীপটার পাহাড়চূড়ায় একটা দালান রয়েছে, সেটার অনেক নীচে মিটমিট করে জ্বলে উঠতে দেখল সবুজ আলো। পাহাড়-প্রাচীরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে ওরা। বিপজ্জনক মনে হওয়ায় মোরেলকে কথাটা বলল রানা।

'বড় একটা গুহার ভেতরে ঢুকেছে চ্যানেল,' জবাব দিল মোরেল। 'উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। আপনি শুধু আলোটা ফলো করুন।'

ইয়টের দু'পাশে গম্ভীরদর্শন পাথর ঝুলে থাকতে দেখছে রানা। অকস্মাৎ তীব্র স্রোত ও ঘূর্ণির মধ্যে পড়ল ফরচুনা, কয়েক মুহূর্তের জন্য এদিক ওদিক কাত হলো ইয়ট, তারপর সেটাকে

পিছনে ফেলে এল, খিলান আকৃতির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

সবুজ আলোটা স্থির হয়ে আছে পাথুরে জেটির শেষ মাথায়, সন্দেহ নেই অপারেট করছে কোনও ধরনের টাইমিং ডিভাইস। আশপাশে আর মাত্র একটা বোট দেখা যাচ্ছে, ঘিয়ে রঙের উপর লাল ডোরা কাটা চল্লিশ ফুটি ডিজেল লঞ্চ। ওটার পাশে চলে এল ফরচুনা, একটা লাইন নিয়ে জেটিতে লাফ দিল আত্রাই।

রানার পিঠে অস্ত্র ঠেকিয়ে ডেকে বের করে আনল একজন গার্ড।

'আপনি আগে,' বলল মোরেল, রানা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ইঙ্গিতে রেইলের ওপারটা দেখাল সে।

রেইল টপকে জেটিতে নামছে রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল বাকি সবাই। পাথুরে সিঁড়ির একপ্রস্থ ধাপ উপর দিকে উঠে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।

মোরেলের পিছু নিয়ে সিঁড়ির মাথায়, ল্যান্ডিং-এ উঠে এল রানা। একটা দরজা খুলল জার্মান-ইহুদি। পাথরের তৈরি প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। শেষ মাথায় পৌঁছে আরেকটা দরজা খুলল মোরেল, কয়েকটা ধাপ টপকে সরাসরি ঢুকে পড়ল বড় একটা হলে।

মেঝেতে দামী কার্পেট। দেয়ালে গাঢ় রঙের ওক কাঠের প্যানেল। আরও একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মোরেল। কামরায় দুজন লোক রয়েছে, দুজনেই ইজরায়েলি। একজনের সামনে, টেবিলের উপর, শর্ট-ওয়েভ ট্র্যান্সমিটিং সেট, মাথায় এয়ারফোন সাঁটা।

অপরজন ডেস্কের পিছনে বসে কী যেন লিখছে। লেখা থামিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। 'তুমি তা হলে সবগুলোকে এক করতে পেরেছ?' হিব্রু ভাষায় জানতে চাইল লোকটা। 'কোনও সমস্যা?'

একই ভাষায় জবাব দিল মোরেল। 'কীসের সমস্যা,

মোরজাই! একদম পানি। সিরিয়ানটা নিজের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমরা তাকে আটক করি। ক্যাপটেন কি ওদেরকে এখন দেখবেন?'

মাথা নাড়ল মোরজাই। 'শুধু মাসুদ রানাকে। আপাতত বাকি সবাই নীচে চলে যেতে পারে। এদিকটা দেখো তুমি, কেমন?'

ঘুরে কালামাই ও ব্রাউনিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে মোরেল, কামরার আরেক দিকে গিয়ে আরেকটা দরজা খুলল মোরজাই। ভিতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করে দিল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর আবার বেরুল মোরজাই। 'এইদিকে, মিস্টার।'

রানা এগোচ্ছে, ওর পিছু নিতে গেল মোরেল, কিন্তু মোরজাই বলল, 'না, মোরেল। ক্যাপটেন বলে দিয়েছেন, মাসুদ রানার সঙ্গে একা দেখা করবেন তিনি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মোরেল। কামরার ভিতর একা ঢুকল রানা। পিছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা, কামরাটার চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা। আরাম-আয়েশের কথা মনে রেখে সাজানো হয়েছে। বিরাট বুক শেলফে রাজ্যের সব বই।

বিস্ময়ের ধাক্কা নিখাদ, যেন কল্পনাকেও হার মানায়, মাথাটা চক্কর দিল, তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারল রানা।

কামরার শেষ প্রান্তে, ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে সুরাইয়া ফারদিন।

# সতেরো

তার পিছনে কাঁচের তৈরি দেয়াল। কাছাকাছি কোথাও থেকে সাগরের আওয়াজ ভেসে আসছে। বাগান থেকে ভেসে আসছে তাজা গোলাপের সুবাস।

'একটু ব্র্যান্ডি নিতে পার, রানা,' বলল সুরাইয়া।

রানা ভাবল, ওকে বিদ্রূপ করছে সে। সাইড টেবিলে কয়েকটা বোতল ও গ্লাস রয়েছে। একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল ও, তারপর এক ঢোকে গিলে ফেলল। তারপর ঘুরে তার দিকে তাকাল।

সামরিক ধাঁচের ড্রিল শার্ট পরেছে সুরাইয়া, গলার কাছটা খোলা, সঙ্গে খাকি প্যান্ট। মাথার চুল লাল রিবন দিয়ে পিছনদিকে বাঁধা। চেহারায় কোনও উদ্বেগ নেই, নেই এতটুকু ভাবাবেগের চিহ্ন। রানার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে শান্ত চোখে তাকিয়ে থেকে।

'কেমন আছ, রানা?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'মোরেল বারবার একজন ক্যাপটেনের কথা বলছিল। তুমিই নাকি?'

'হ্যাঁ, মোসাদের সামরিক শাখায় আছি,' শান্তকণ্ঠে বলল সুরাইয়া। 'মেডেটেরেইনিয়ান এলাকার গ্রুপ ক্যাপটেন। আমার নাম সুরাইয়া ক্যারাভান।'

'ফারদিন নয়?' রানার গলায় একটু শ্লেষ।

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'আমার বাবা ড্যানি ক্যারাভান, সেনাবাহিনীতে কর্নেল ছিলেন। মা মেয়ার ক্যারাভান, মোসাদের কর্মকর্তা ছিলেন।'

'তার মানে আমাকে যা যা বলেছ সবই মিথ্যে ছিল?'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'না। সত্যি সত্যি আরব জঙ্গিদের বোমা হামলায় আমার মা-বাবা সহ সব আত্মীয়স্বজন মারা যান।

আমার বয়স তখন তিন কি চার। আশ্রয় জোটে একটা খ্রিশ্চান মিশনারিতে, আমাকে স্পাই বানাবার প্ল্যানটা তখনকারই।

'বহু বছর আমি আমার নিজের পরিচয় জানতাম না, নিজেকে বেদুঈন কন্যা হিসেবেই চিনতাম, মনে মনে ঘৃণা করতাম মুসলিমদের জাত শত্রু ইজরায়েলকে। তারপর, চব্বিশ বছর বয়েসে, আমাকে আমার আসল পরিচয় জানানো হলো। আমার ছোটবেলার ফটো দেখানো হলো। দেখলাম একটু একটু মেলে।

'ওঁরা বললেন, আরেকটা ছবি দেখো। ছবিতে ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীকে দেখলাম। আমার চেহারার সঙ্গে দুজনেরই অনেকটা মিল আছে। আমাকে প্রশ্ন করা হলো, বেদুঈন এরা? আমি বললাম, না তো। ওঁরা বললেন, ইনি তোমার মা, মোসাদ এজেন্ট ছিলেন। আর পাশের ভদ্রলোক তোমার বাবা, ছিলেন কর্নেল। সবশেষে তারা জানালেন, এখন দেশ তোমার কাছ থেকে সার্ভিস চায়।'

গোটা ব্যাপারটা হজম করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল রানা।

'লন্ডন থেকে তুমি সরে এলে কেন?' জানতে চাইল ও।

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সুরাইয়া ক্যারাভান, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সরে আসতে হয় আমার ওপরওয়ালা কর্নেল ইয়েলিচের নির্দেশে। তিনি হঠাৎ ব্যাপারটা লক্ষ করেন, বুঝতে পারেন আমিও তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। নির্দেশ এল সমস্ত ছেড়েছুড়ে সাইপ্রাসে চলে যাও।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'তিন মাস পর আমাকে তুমি স্যালামেস বন্দরে ডেকে পাঠালে,' বলল রানা। 'কেন?'

'ইজরায়েলের পরম এক শত্রু আমার প্রতি দুর্বল, তাই কর্নেল ইয়েলিচ প্ল্যান করলেন স্যালামেসে নিয়ে এসে তাকে প্রথমে বন্দি ও পরে খুন করা হবে। যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার উপর কর্নেলের রাগ ছিল। তাঁর জিদ আমাকে দিয়ে তোমাকে খুন

করাবেন – তাঁর ঠিক করে রাখা জায়গায়।’

‘সব দোষ তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছ নাকি?’ ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি ইহুদি, তুমি মুসলমান, এটা জানার পর ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হলো। তুমি তো জানো, এ দুটো কত কাছাকাছি। কর্নেলের নির্দেশ আমি খুশি মনে পালন করেছি।’

‘আমাকে খুন করা হবে, কিন্তু কই,’ রানা বিস্মিত, ‘আমার ওপর তো হামলাই হয়নি!’

‘হয়নি পরিস্থিতির কারণে,’ বলল সুরাইয়া। ‘তোমার চারপাশে সিরিয়ান ও অন্যান্য এজেন্সির প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছিল। আমরা মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে চাইনি। তা ছাড়া, হঠাৎ করে আমার বস্ কর্নেল ইয়েলিচের কাছ থেকে তাগাদা আসল ফিলিস্তিনি পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর মোসাদ্দেক মাসলানকে খতম করো।’ শ্রাগ করল সে। ‘সেই সঙ্গে বলা হলো, তুমিও খুন হয়ে যাও – মাসুদ রানার চোখে, সে যাতে তোমার খুনিকে ধরার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের পছন্দমত অ্যারেনায় পৌঁছায়, লেসবসে।’

‘শুধু আমাকে খুন করার জন্যে এত কিছু?’

‘না। তোমাকে টোপ খাইয়ে নিয়ে আসব, এটা একটা প্ল্যান। দ্বিতীয় প্ল্যান...’ ক্ষীণ একটু হাসল সুরাইয়া ক্যারাভান, বলল না কী সেটা। ‘এটাই আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট, রানা। এর জন্যে দশ মাস এক্সটেনসিভ ট্রেনিং নিতে হয়েছে আমাকে।’

‘প্লেনটা আকাশে বিস্ফোরিত হওয়ায় বেশ কজন নিরীহ লোক মারা যায়,’ বলল রানা। ‘তাদের মধ্যে পাইলট রাহি সামদানিও ছিল। শুনেছি তোমার প্রতি দুর্বলতা ছিল তার। তুমিও নিশ্চয় জানতে।’

‘জানতাম। দুর্বলতা– সে তো তোমারও ছিল, রানা,’ বলল সুরাইয়া। ‘কিন্তু আমি আমার দেশকে আরও অনেক বেশি ভালবাসি, দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এরকম আরও বহু নিরীহ

মানুষকে খুন করতে পারি আমি। এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে আমাকে।'

মগজ ধোলাই, একেবারে নির্ভেজাল একটা ফ্যানাটিক বানিয়ে ছেড়েছে, ভাবল রানা। 'যাক, এখন কী হবে?' জানতে চাইল ও।

'আগে এখানে আমাদের কাজটা শেষ করি, তারপর...'

'এখানে তোমাদের কাজ। জানতে পারি, কী সেটা?' দ্রুত প্রশ্ন করল রানা।

রানা কামরায় ঢোকার পর এই প্রথম খিলখিল করে হেসে উঠল সুরাইয়া। 'তুমিও জানো কী সেটা। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোপনে মিটিঙে বসবে এদিকে কোথাও, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে একটা মহা পরিকল্পনা তৈরি করতে চায়। সবগুলোকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সমর্থক দেশগুলোর অবযারভার সহ।'

রানা জানে, আরব প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের এই গোপন মিটিঙের কথাই বলেছিলেন ওকে বিসিআই চিফ রাহাত খান।

ওর এই চিন্তিত ভাব টেরেসের গাঢ় ছায়া থেকে একটা মেশিন-পিস্তল বের করে আনল, সেটা ধরে রেখেছে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ইজরায়েলি বডিগার্ড।

তথ্য দরকার রানার। বলল, 'ওঁদের চারপাশে কী ধরনের সিকিউরিটি আছে কল্পনা করতে পার? তোমরা অসম্ভব একটা কাজে হাত দিয়েছ।'

'বুদ্ধি খরচ করে সাবধানে প্ল্যান করলে সবই সম্ভব,' বলল সুরাইয়া, ডেস্কে একটা চার্টের ভাঁজ খুলল। 'এই হলো কারপস্, এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে বুলন্দি দ্বীপ, এখানেই বসছে মিটিংটা। কাল দুপুর দুটোয় একটা ডিজেল ইয়টে চড়ে প্রমোদভ্রমণে বেরুবে ইজরায়েলের এই দুশমনরা। কী ভাবছ, গড়গড় করে সব বলে ফেলছি শুনে?' মাথা নেড়ে হাসল সে। 'আসলে তোমার খুশি হবার কোনও কারণ নেই।'

'জানি,' বলল রানা। 'সম্ভবত তার আগেই আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান রয়েছে।'

'সেরকম একটা প্ল্যানই করা হবে, তবে এখানে নয়,' বলল সুরাইয়া। 'কাল তোমাদেরকে মেইনল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'প্রমোদভ্রমণ সম্পর্কে কী যেন বলছিলে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ও, হ্যাঁ। বেলা তিনটের দিকে একটা লাল বয়ার পাশে থামবে তাদের ডিজেল ইয়ট। চ্যানেলের বিশেষ একটা পজিশনে রাখা হয়েছে বয়াটাকে, ওখান থেকে ওয়াটার স্কিইং-এর একটা এগজিবিশন দেখবে সবাই। বুঝতেই পারছ, ওদের প্রোগ্রাম ও মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছুই আমাদের অজানা নেই।'

'ধরে নিচ্ছ, ওদের সিকিউরিটি এতই দুর্বল যে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে তোমরা?'

'ওখানে আমাদের থাকারই দরকার নেই,' বলল সুরাইয়া। 'কাল ভোরে বুলন্দি দ্বীপ ছাড়িয়ে স্কিন-ডাইভিং করতে যাচ্ছি আমি।'

'ভোরে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভ্রূর মাঝখানে চিন্তার রেখা। 'বুঝলাম না।'

'বুঝবে, রানা। দুনিয়ার সব কাগজে ছাপা হবে খবরটা।' একটা বোতামে চাপ দিল সুরাইয়া। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মোরজাই। 'ওর সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে। ওকে নিয়ে গিয়ে বাকিগুলোর সঙ্গে রাখো,' এমন সুরে বলল, ওরা সবাই যেন কুকুর-বিড়াল।

মেশিন-পিস্তল নিয়ে পিছনে থাকল সুরাইয়ার বডিগার্ড, মোরজাইয়ের পিছু নিয়ে পাশের কামরায় বেরিয়ে এল রানা।

ডেস্কের কিনারায় বসে রয়েছে মোরেল, হাতের সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে। রানাকে দেখে মৃদু হাসল সে। 'জীবনটা

সারপ্রাইযে ভরা, তাই না, হের রানা?’

পিঠে মেশিন-পিস্তলের গুঁতো খেয়ে এগোল রানা। বডিগার্ডের সঙ্গে মোরেলও আসছে। হল পেরিয়ে এসে একপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে বাড়িটার পিছনদিকে নামল।

নীচে একটা ওয়াইন সেলার। ভিতরে ঢুকল রানা। আলোর উৎস একটা ইলেকট্রিক বালব। মোরেলের দুজন গার্ড, কালামাই ও ব্রাউনি, মেঝেতে বসে তাস খেলছে, তাদের সাব-মেশিনগান দেয়ালে খাড়া করা।

ওদেরকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো ব্রাউনি, পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে জানতে চাইল, ‘কোথায় রাখব বন্দিকে?’

‘ওঁর বন্ধুদের সঙ্গে,’ হাসিমুখে বলল মোরেল। ‘ওখানে ওদের সবাইকে পাবেন, হের রানা, শুধু আপনার গার্ল ফ্রেন্ডকে বাদে।’

থমকে দাঁড়াল রানা। ‘মানে?’

‘তাকে একটা সেলে একা রাখা হয়েছে,’ বলল মোরেল। ‘কর্নেল সুরাইয়ার নির্দেশ – আইরিন মুসলমান মেয়ে, এতগুলো পুরুষের সঙ্গে তার থাকা উচিত নয়।’

বেশ কয়েকটা দরজাকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। প্রতিটি দরজায় লোহার ছোট গ্রিল আছে। একটার ভিতর আইরিনের ফ্যাকাসে মুখটা পলকের জন্য দেখতে পেল ও। উল্টোদিকের দরজায় থামল ওরা। কবাট খোলার পর বিমূঢ় কয়েকটা মুখ দেখা গেল। পিছন থেকে পিঠে ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে রানা।

কাফ্রি সরদার ও মোল্লা বখতিয়ার চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন লেমনস্কি। অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন মেনদেরেস।

খানিক পর রানার পাশে এসে বসলেন তিনি। ‘তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরুতে পারলে ভাল, তা না হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে

যাব আমি।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরালেন।

'একেবারে পাগল হয়ে গেলে তো বিপদ,' বলল রানা।

'ব্যঙ্গ করছেন? তা করুন। এটা আমার প্রাপ্য।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন। 'তা-ও তো জানেন না আমি কী ব্লান্ডার করে ফেলেছি।'

'কী ব্লান্ডার?' জিজ্ঞেস করল রানা, যেন কিছু জানে না।

'আমাকে সুইসাইড করতে হবে,' আক্ষেপের সুরে বললেন সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। 'মধ্যপ্রাচ্যকে ডুবিয়ে দিয়েছি।'

তাঁর কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিল রানা। 'এত অস্থির হবেন না। আমার ধারণা এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।'

'ইয়াংম্যান, আপনি কিছু জানেন না...'

'আমি জানি,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা।

'কী জানেন, কী করে?' মেনদেরেস হতভম্ব।

'সব পরে জানবেন। আগে ভেবে দেখি, আপনার কোনও সাহায্যে আসা যায় কি না। আশা করি একটা উপায় ঠিকই বেরিয়ে আসবে। কটা বাজে?'

হাতঘড়ি দেখলেন মেনদেরেস। 'দুটো।'

'বুলন্দি দ্বীপের ওদিকে যেতে হলে একটু পরেই রওনা হতে হবে ওদেরকে,' বলল রানা। 'তিন ঘণ্টার পথ।' তারপর বাতাস শুঁকে মেনদেরেসের হাতে ধরা সিগারেটটার দিকে তাকাল। 'আপনি কি গাঁজা খাচ্ছেন?'

একটু থতমত খেয়ে মেনদেরেস বললেন, 'মানে... হ্যাঁ। জানি খুব বাজে অভ্যাস, কিন্তু ছাড়তে পারি না।'

হেসে উঠল রানা। 'আমি আপনাকে ছাড়তে বলছি না।'

মেনদেরেস বললেন, 'আচ্ছা, ওখানে পৌঁছে কী করবে ওরা?'

'সম্ভবত চ্যানেলে একটা শক্তিশালী লিমপেট মাইন রেখে আসবে। ঘটনার সময় ওখানে তাদের থাকার দরকার নেই,

সুরাইয়ার এই কথা শুনে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে।'

'কিন্তু ওই চ্যানেল ধরে অসংখ্য বোট আসা-যাওয়া করছে,' বললেন মেনদেরেস। 'আজ পর্যন্ত এমন লিমপেট মাইনের কথা কেউ শোনেনি যেটা তার ভিক্টিমকে খুঁজে নিতে পারে।'

'তা হলে হয়তো টাইম, কিংবা রিমোট-কন্ট্রোলড্ বোমা।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মেনদেরেস বললেন, 'একটা বোমা বা পিস্তলের বিনিময়ে কী না দিতে পারি!'

'আছে,' বলল রানা। 'আইরিনের কাছে।'

'সত্যি? কিন্তু কীভাবে?'

বলল রানা।

'পিস্তল থাকলেই বা কি,' সব শুনে বললেন মেনদেরেস। 'আইরিন তো অন্য সেলে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রুশ কর্নেল লেমনস্কির দিকে তাকাল রানা, ভদ্রলোক এখনও গ্রিলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'বাইরের খবর কী?'

শ্রাগ করলেন লেমনস্কি। 'ওরা দুজন, কালামাই আর ব্রাউনি, মেয়েদের সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছিল,' বললেন লেমনস্কি। 'সেই থেকে আইরিনের সেলে ঢোকার জন্যে ছটফট করছে কালামাই, ব্রাউনি বারবার তাকে সাবধান করে দিয়ে বলছে কর্নেল সুরাইয়া যদি জানতে পারে যে মেয়েটার গায়ে হাত দেয়া হয়েছে তা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

'থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট,' বলল রানা। 'আর কিছু?'

'একটু পরপরই জানতে চাইছে আমাদের কাছে সিগারেট আছে কি না।'

'এরপর বলবেন, আছে,' বলে মেনদেরেসের সামনে হাত পাতল রানা। 'দেখান।' হাতে পেয়ে খুলল প্যাকেটটা, ভিতরে ছ'টা সিগারেট রয়েছে। 'সবগুলোয় মাল ভরা তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকালেন মেনদেরেস। প্যাকেটটটা আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'চাইলে দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেনদেরেস।

মাত্র তিন মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। মেনদেরেসের কাছে সিগারেট চাইল গার্ডরা। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাতবদল হয়ে গেল প্যাকেটটা। সেটা নিয়ে গার্ডরা কী করে দেখবার জন্য গ্রিলের সামনে চলে এল রানা।

প্রথমেই মোরেলকে দেখল ও, ওয়াইন সেলারে ঢুকছে। গার্ডদের কিছু বলল সে, শুনে সাব-মেশিনগানটা তুলে নিয়ে দ্রুত দোতলায় উঠে গেল ব্রাউনি। হেঁটে এসে দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়াল জার্মান-ইহুদি মোরেল।

'হের রানা, আপনাকে আমি বলতে এলাম যে আমরা রওনা হচ্ছি,' বলল সে। 'চিন্তা করবেন না, দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব।'

'আমি অতটা নিশ্চিত নই,' বলল রানা।

হেসে উঠে চলে গেল মোরেল।

কয়েক মিনিট পর ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল রানা। শব্দটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর ভৌতিক একটা নীরবতা নেমে এল চারদিকে। লুকিয়ে রাখা প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল কালামাই। প্রথম টানেই গাঁজার গন্ধ পেয়ে হাতের শলাটা খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর আপনমনে হেসে কষে টান দিল আরেকটা, ফুসফুসে অনেকক্ষণ আটকে রাখবার পর ধোঁয়া ছাড়ল।

রানাও হাসল আপনমনে। ওর জানা আছে, এভাবে বার কয়েক টান দিলে নেশা ধরতে বেশি সময় লাগবে না কালামাইয়ের। গ্রিলের সামনে থেকে সরে এসে মেনদেরেসের পাশে বসল ও।

অন্ধকারে সময় কাটছে না। করবার কিছু না থাকায় ওরা

সবাই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইজরায়েলিদের ইয়ট রওনা হওয়ার পর আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আট ঘণ্টা।

হঠাৎ হাসির শব্দ ভেসে এল। কালামাইয়ের গলা। তারপর গান ধরল সে।

মেনদেরেস ও রানা দৃষ্টি বিনিময় করল। সিধে হয়ে গ্রিলের সামনে চলে এল ওরা।

নেশাটা ভালই ধরেছে কালামাইকে। ওদের উল্টোদিকের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে টলছে সে, কাঁপা কাঁপা হাতে আরেকটা সিগারেট ধরাচ্ছে। এটা নিয়ে তার বোধহয় তিনটে খাওয়া হবে।

সেলটার দরজায় হালকা ঘুসি মারছে কালামাই। 'কালামাইকে একটু দয়া করো, ডার্লিং। জানি তুমি সুন্দরী, কিন্তু আমিও তো লম্বা-চওড়া তাগড়া যোয়ান! প্লিজ, দরজাটা খোলো। লক্ষ্মীটি!'

সিগারেটে টান দিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল কালামাই। 'আরে, আমি কী বোকা!' পকেটে হাত ভরে কয়েক সেকেন্ড হাতড়াবার পর এক গোছা চাবি বের করল সে।

সেলের ভিতর থেকে আইরিন কোনও শব্দ করছে না। তালায় চাবি ভরে ঘোরাল কালামাই, ভারি কবাটটা ঠেলল দুই হাতে। দেয়ালে ধাক্কা খেল কবাট, হাতের সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে ভিতরে ঢুকল সে।

দুর্বোধ্য কী যেন বলল আইরিন, জবাবে খেঁকিয়ে উঠল কালামাই। এক মুহূর্ত পর সেল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মেয়েটা, পরনের ড্রেস কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। তবে ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে পিস্তলটা।

তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল কালামাইও। তার দিকে ঘুরল আইরিন, অস্ত্র ধরা হাতটা লম্বা করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, কালামাইয়ের খুলির একটা পাশ উড়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে কালামাই। লাশ টপকে চাবির গোছাটা দরজা থেকে খুলে নিল আইরিন, ঘুরে চলে এল

উল্টোদিকের সেলের দরজায়।

হাত দুটো এত কাঁপছে যে চারবারের চেষ্টায় কি-হোলে চাবি ঢোকাতে পারল আইরিন। দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে এসে সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল রানা, তারপর দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল।

সাড়ে ছ'ফুট লম্বা সুরাইয়ার বডিগার্ড এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির মাথায়, হাতে বাগিয়ে ধরা মেশিন-পিস্তল। লাফ দিয়ে পিছু হটল রানা, ফায়ার করল দেয়ালের কোণ থেকে। চেঁচিয়ে উঠে ধাপের উপর মাথা দিয়ে পড়ল বডিগার্ড, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে এল সিঁড়ির নীচে।

মেঝে থেকে তার মেশিন-পিস্তলটা তুলে নিলেন মেনদেরেস। 'এরপর কী?'

'হলের ডানপাশের কামরায় রেডিও আছে,' বলল রানা। 'ওটা দিয়ে মেসেজ পাঠানো যায়।'

'গুড আইডিয়া!' সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছেন মেনদেরেস। তাঁর পিছু নিল রানা। বাকি সবাইও ওদের সঙ্গে আসছে।

হল খালি পড়ে আছে। খানিক এগিয়ে ডানদিকের কামরাটায় ঢুকলেন মেনদেরেস। এক মুহূর্ত পর এক লোকের চিৎকার ও মেশিন-পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে রানার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মেনদেরেস।

এই সময় হলের আরেক মাথা থেকে ব্রাশ ফায়ার শুরু হলো। পাল্টা গুলি করবার জন্য ঘুরছে রানা, ওর পাশের দেয়াল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মোল্লা বখতিয়ার, ডান হাত দিয়ে বাম বাহু খামচে ধরেছে।

'এখান থেকে এদেরকে নামিয়ে নিয়ে যান,' গলা চড়িয়ে লেমনস্কিকে বলল রানা। 'ইয়টে পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন। আমরা কাভার দিচ্ছি।'

হলের শেষ মাথার বাঁক থেকে একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে দেখে

গুলি করল রানা। ওর পিছনে বুড়ো বখতিয়ারকে হাঁটতে সাহায্য করছে কাফ্রি সরদার ও লেমনস্কি। ওদের সামনে ছুটছে আইরিন।

কয়েক মুহূর্ত পর খোলা দরজার কাছ থেকে ডাকলেন রাশিয়ান কর্নেল। মেনদেরেস ও রানার হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল, ধীরে ধীরে পিছু হটছে দুজন, তারপর ঘুরে নিরাপদ জায়গায় চলে এল।

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজার বোল্ট লাগিয়ে দিল রানা। সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে নামল ওরা, ওয়াইন সেলারকে পাশ কাটিয়ে একটা প্যাসেজ ধরে বেরিয়ে এল জেটির কাছাকাছি।

জেটিতে এখনও জ্বলছে সবুজ আলোটা। ওদের ইয়ট ফরচুনা গুহার ভিতর ঢুকে পড়া অলস ঢেউয়ের ধাক্কায় মৃদু দোল খাচ্ছে। ধাপ বেয়ে জেটিতে নামছে ওরা, দূর থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল। রানা ধারণা করল, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে ইজরায়েলিরা।

কাফ্রি সরদার মোল্লা বখতিয়ারকে ডেকে নামতে সাহায্য করছে। হাতের সাব-মেশিনগানটা লেমনস্কির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, তারপর এক দৌড়ে হুইলহাউসে গিয়ে ঢুকল।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিতেই একটা চিৎকার ভেসে এল, সেই সঙ্গে ধাপগুলোর মাথায় উদয় হলো কয়েকজন লোক। তারা গুলি শুরু করলেও, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ইয়ট ছেড়ে দিল রানা।

বুলেটের আঘাতে হুইলহাউসের একটা গ্লাস প্যানেল চুরমার হয়ে গেল, পাল্টা জবাব দিলেন মেনদেরেস ও লেমনস্কি। একটু পরেই সাগরের দিকে ছুটল ওদের ইয়ট।

# আঠারো

বিরাট সব ঢেউ সাগরে। কোনও কোনও ঢেউয়ের চূড়া ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে রানার মাথা ও কাঁধ। মুখে লবণের স্বাদ।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কাফ্রি সরদার। 'সার্চ করে এলাম, মিস্টার রানা। খোলের কোনও ক্ষতি আমার চোখে পড়েনি।'

'মোল্লা বখতিয়ারের কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'আরও খারাপ হতে পারত। হাতের খানিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। মেয়েটার সাহায্য নিয়ে কর্নেল লেমনস্কি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছেন।'

সরদার বেরিয়ে যেতে ভিতরে ঢুকলেন মেনদেরেস।

'রেডিওটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নষ্ট দেখলাম। এখন কি হবে, ইয়াং ম্যান?'

'বুলন্দি দ্বীপের ওদিকে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আমিও তা-ই ভাবছিলাম,' সায় দিলেন মেনদেরেস। 'পিছু নেয়া উচিত আমাদের। জানা দরকার কী করছে ওরা।'

'আবহাওয়া ভাল থাকলে ভোরের মধ্যে ওদেরকে ধরে ফেলব,' বলল রানা। 'আশা করি তখনও ওদের কাজ শেষ হবে না।'

'কিন্তু আমাদের চেয়ে প্রায় একঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে তারা।'

হাসল রানা। 'সেটা জেনেই বলছি।'

'ধরুন তবু যদি গিয়ে দেখি যে কাজটা শেষ করে ফেলেছে, তখন কী হবে? কী করল, আমরা জানব কীভাবে? আপনাকে

বলেছে স্কিন-ডাইভিং করতে যাচ্ছে, মনে আছে তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর সরদারকে ডেকে ইয়টের ডাইভিং ইকুইপমেন্ট চেক করতে বলল। তার সঙ্গে মেনদেরেস বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল লেমনস্কি। 'মোল্লা বখতিয়ারকে কেমন দেখছেন?' জানতে চাইল রানা।

'ভাল। ঘুমাচ্ছেন।'

'যাক।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

'মিস্টার মেনদেরেস বললেন ধাওয়া শুরু করেছি আমরা। মিস্টার রানা, অ্যাকুয়ালাঙ ব্যবহার করতে জানি আমি।'

'গুড।'

'গুড মানে কি আপনাদের সঙ্গে পানির নীচে আমিও থাকতে পারব?' জানতে চাইলেন কর্নেল লেমনস্কি।

'হ্যাঁ, পারবেন।'

'এক ঘণ্টার জন্যে হুইলে থাকি আমি,' বললেন লেমনস্কি। 'নীচে কফি বানাচ্ছে আইরিন।'

ডেকে বেরিয়ে এসে রেইলের সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল রানা। সাগর অন্ধকার, দেখবার কিছু নেই। নীচে নেমে দেখল সেলুনের মেঝে ও টেবিলের উপর অ্যাকুয়ালাঙ সহ নতুন কয়েক সেট ডাইভিং ইকুইপমেন্ট সাজিয়ে রাখছে কাফ্রি সরদার, তাকে সাহায্য করছেন মেনদেরেস। ওগুলোর সঙ্গে এমনকী নতুন একজোড়া স্পিয়ার গানও দেখা যাচ্ছে।

'এগুলো কোত্থেকে এল?' জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার মেনদেরেস কিনেছেন, আপনি যখন আবুযারে গিয়েছিলেন,' জানাল সরদার।

ধূসর চেহারা ও একটু শীত শীত ভাব নিয়ে হাজির হলো ভোর। ঢেউগুলো আগের মত বড়ই থাকল আকারে। হুইলে সরদার রয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে ধূমায়িত মগ থেকে কফি

খাচ্ছে রানা।

ডেনিম প্যান্ট ও ভারী সোয়েটারের নীচে ডাইভিং ড্রেস পরে আছে ও। বেল্টে আটকেছে কর্ক-এর হাতলওয়ালা ভারী ছুরি, কবজিতে বেঁধেছে প্রেশার গজ ও কম্পাস। মগটা নামিয়ে রেখে বিনকিউলার তুলে নিয়ে সামনে তাকাল ও।

'কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা।'

গায়ে মোটা কোট চাপিয়ে ডেক থেকে ভিতরে ঢুকলেন মেনদেরেস। 'বুলন্দিকে ছাড়িয়ে কোন্ দিকে গেছে ওরা কে জানে।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'পাঁচটা।' ধূসর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকালেন। 'দশ ঘণ্টা পর জিরো আওয়ার।'

চার্টের দিকে ফিরল রানা, নিজেদের কোর্স-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল কোন্ দিকে ক'মাইল এসেছে ওরা, তারপর পেন্সিলটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর।

'ইয়েস?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন মেনদেরেস।

'বুলন্দির দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছি আমরা, দূরত্ব দু'মাইলের বেশি নয়,' বলল রানা। 'ইঞ্জিন বন্ধ করুন, সরদার।'

ডেকে বেরিয়ে এল রানা, দেখল সেলুন থেকে উপরে উঠে আসছেন লেমনস্কি, তার পিছু নিয়ে আইরিনও। ভারী একটা সোয়েটার পরেছে সে, আস্তিন গুটানো। রাশিয়ান কর্নেল পরেছেন সুইমিং শর্টস ও উইন্ডচিটার।

'থামতে হলো কেন?' জানতে চাইল আইরিন। 'পৌঁছে গেছি নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সবাই চুপ। দেখি কিছু শুনতে পাই কি না।'

ঢেউয়ের মাথায় চড়ল ইয়ট, পানির ঢাল বেয়ে নামল। কান খাড়া করে রেইলিং-এ দাঁড়িয়ে আছে রানা। ডেকের খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা গাংচিল, তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে। দূরে কোথাও বজ্রপাতের মত ভারী একটা আওয়াজ হলো।

‘কীসের শব্দ?’ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন লেমনস্কি।

‘দ্বীপটার কাছাকাছি রিফের ওপর আছড়ে পড়ছে সাগর,’ বলল রানা।

চোখে বিনকিউলার নিয়ে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেনদেরেস। হঠাৎ আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করলেন তিনি, চোখে-মুখে উত্তেজনা নিয়ে হাত তুলে সামনের দিকটা দেখালেন। ‘কী যেন দেখলাম। মনে হলো কুয়াশা সরে গিয়েছিল। আধ মাইল দূরে।’

বিনকিউলার নিয়ে হুইলহাউসের ছাদে চড়ল রানা। বাতাস ছেড়েছে, ফলে কোথাও কোথাও বেশ হালকা হতে শুরু করেছে ধূসর কুয়াশা। আর বোধহয় এক ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রানার যেন মনে হলো একটা ঢেউয়ের চূড়ায় স্পার-বয়া দেখতে পেয়েছে। পানির ঢাল ধরে বিশাল গহ্বরের ভিতর নামল ফরচুনা, তারপর উঠছে আবার। বিনকিউলার যখন ফোকাস করছে, কুয়াশার এবড়োখেবড়ো গর্তের ভিতর দিয়ে রানার দিকে যেন লাফ দিল বোটটা। ঘিয়ে রঙের খোল, ওয়াটারলাইনের উপর লাল ফিতের মত দাগ।

কবজিতে বাঁধা কম্পাসে ওটার অবস্থান রেকর্ড করে নিয়ে লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা। ‘আছে ওটা ওখানে,’ বলে ঘুরে হুইলহাউসের ভিতরে তাকাল, নতুন কোর্স দিল কাফ্রি সরদারকে। ‘হাফ-স্পিডে চলুন, কাছাকাছি পৌঁছাবার পর ফুল স্পিড দেবেন।’

মাথা ঝাঁকাল কাফ্রি সরদার।

মেনদেরেস ও লেমনস্কির দিকে ফিরল রানা। ‘আসুন, তৈরি হই।’

সেলুনে নেমে এল ওরা। টেবিলে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে মোল্লা বখতিয়ার, ডান হাতটা স্লিং-এর সঙ্গে ঝুলছে। চার্ট ড্রয়ার খুলে .৩৮ কার্তুজের একটা বাক্স বের করে মেনদেরেসের

দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

'স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন নিয়ে সরদারের সঙ্গে হুইলহাউসে থাকবেন আপনি,' বলল রানা, তারপর লেমনস্কির দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'আর সব অস্ত্রের কী অবস্থা?'

'দুটো মেশিনগানেই কিছু কিছু বুলেট আছে।'

'কাজেই বুঝেশুনে খরচ করতে হবে। হামলা শুরু হবার পর আপনি ফরওয়ার্ড থেকে লাফ দেবেন। আমি লাফ দেব স্টার্ন থেকে।'

নিজের সাব-মেশিনগানটা তুলল রানা। ঘুরতে যাচ্ছে, ওর কাঁধে হাত রাখল আইরিন। 'আমার আর আব্বার কী হবে?'

'তোমরা এই জায়গা ছেড়ে একদম নড়বে না,' বলল রানা। 'ওপরে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকব আমরা।'

উপরে উঠে এসে ইয়টের কোর্স হাফ-পয়েন্ট বদল করল রানা, সরদারের কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে কুয়াশা ভেদ করতে চেষ্টা করছে। ভাঙা জানালা দিয়ে দমকা বাতাসের ঢুকে পড়া খেয়াল করল ও। একটু কাত হলো ফরচুনা। হঠাৎ বিরাট একটা জায়গা থেকে সরে গেল ধূসর কুয়াশার পরদাটা।

দুশো গজ দূরে, স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে ইজরায়েলি বোট। ওটার পিছনে রিফে আছাড় খেয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে সাগর, সাদা ফেনা মেশানো পানির বিস্তৃতি সেঁধিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার ভিতর। কাফ্রি সরদারের কাঁধে একটা চাপড় মারল রানা।

ফুল স্পিড দিল সরদার। গোটা বোট যেন পানি ছেড়ে উড়ে চলেছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ গুরুগম্ভীর গর্জনে পরিণত হলো। ডেক ধরে ছুটে স্টার্নে চলে এল রানা, হাতে বাগিয়ে ধরা সাব-মেশিনগান।

ইজরায়েলি লঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো জার্সি পরা এক নাবিক, একপ্রস্থ রশি কুণ্ডুলী পাকাচ্ছে। কুয়াশা থেকে ওদেরকে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠল সে, পরমুহূর্তে

চিৎকার জুড়ে দিল। ছুটল সে, ছোট একটা মই বেয়ে হুইলহাউসে উঠে যাচ্ছে।

রানা সচেতন, রেইলের কাছে গুড়ি মেরে রয়েছেন লেমনস্কি, হাতের মেশিন-পিস্তল তৈরি। দুই বোটের ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সরদার, সেই সঙ্গে বন বন করে হুইল ঘোরাল। স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে যাওয়ার সময় ইজরায়েলি লঞ্চের স্টার্নে ঘষা খেল ইয়ট।

রেইল টপকে লাফ দিল রানা, লঞ্চের ভিজে ডেকে পা পিছলে যাওয়ায় আছাড় খাওয়ার উপক্রম করল। হোঁচট খেয়ে কয়েক পা এগোল ও, ভারসাম্য ফিরে পেতেই দেখল মেশিন-পিস্তল থেকে গুলি করতে করতে কম্প্যানিওনওয়েতে বেরিয়ে আসছে ব্রাউনি।

রানার এক পশলা বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তার বুক, শরীরটা পিছনদিকে লাফ দিয়ে ফিরে গেল কেবিনে।

হুইলহাউসের লোকটা মরিয়া হয়ে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক কি দুবার কাশি দিয়ে বোবা হয়ে থাকল লঞ্চের ইঞ্জিন। তাকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করলেন লেমনস্কি, তারপর জানালাগুলোকে পাশ কাটিয়ে সেদিকে ছুটলেন। একটা আর্তনাদ শোনা গেল, হুইলহাউসের দরজার উপর আছড়ে পড়েছে লোকটা, একটা হাত ডেকের দিকে ঝুলছে।

কম্প্যানিওনওয়ের মাথার দিকে এগোচ্ছে রানা, গলা চড়িয়ে হিব্রু ভাষায় বলল, 'ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো!'

ওর সঙ্গে যোগ দিলেন লেমনস্কি, দরজার আরেক পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'লাস্ট ওয়ার্নিং,' বলল রানা।

একের পর এক অনেকগুলো বুলেট দরজার কিনারা চুরমার করে দিচ্ছে, লাফ দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে এল রানা। ঘুরলেন লেমনস্কি, লাফ দিয়ে রেইল টপকে ফরচুনার ডেকে নামলেন। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে অপেক্ষায় থাকলেন বড় একটা ঢেউ যতক্ষণ না দুটো জলযানকে একসঙ্গে

উপরে তুলল, তারপর সেলুনের একটা পোর্টহোল লক্ষ্য করে খালি করলেন নিজের মেশিন-পিস্তল। তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, অকস্মাৎ বন্ধ হলো ফায়ারিং।

লাফ দিয়ে ইজরায়েলি লঞ্চে ফিরে এলেন লেমনস্কি। 'আর বোধহয় কেউ নেই,' রানাকে বললেন তিনি।

'তার মানে হলো আমরা দেরি করে ফেলেছি,' বলল রানা। 'নিজেদের কাজে বেরিয়ে পড়েছে ওরা।' সাব-মেশিনগানটা রাশিয়ান কর্নেলের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'কাভার দিন। নীচে যাচ্ছি।'

দোরগোড়ায় ব্রাউনির লাশ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। লাশ ও রক্ত টপকে সেলুনের ভিতর ঢুকল রানা। মুখ থুবড়ে মেঝে ও রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে মোরেল। লেমনস্কির শেষ বুলেটগুলো বোধহয় সবই তার পিঠে লেগেছে।

পা দিয়ে ঠেলে তাকে চিৎ করল রানা। চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, তবে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। জিভের ডগা দিয়ে নীচের ঠোঁটটা একবার ভিজিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'ক্যাপটেন সুরাইয়াকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, রওনা হবার আগে আপনাকে যেন মেরে রেখে যান।' হতাশায় মাথা নাড়ল সে।

'কাজের কথা বলো,' তাগাদা দিল রানা। 'সাগরের নীচে কি করছে ওরা? কজন নেমেছে?'

'ওরা পাঁচজন নেমেছে রিফের নীচে,' বলল জার্মান-ইহুদি জিমি মোরেল। 'ক্যাপটেন সুরাইয়াকে সাহায্য করছে আত্রাই ছাড়াও তিনজন মোসাদ অপারেটর। আমি চাই ওদের পিছু নাও তুমি, মাসুদ রানা, ওরা যাতে ওখানেই তোমার কবরের ব্যবস্থা করতে পারে।'

'কী করতে নেমেছে ওরা?' প্রশ্নটা আবার করল রানা।

'চ্যানেলের ওদিকটায়... লাল একটা বয়া... আজ দুপরে

ওখানেই নোঙর ফেলবে মন্ত্রীদের ইয়ট। ওই বয়ায় একটা চার্জ ফিট করতে গেছে ওরা, পারলে ঠেকাও!'

'কিন্তু ডেটোনেট করবে কীভাবে? সুরাইয়া আমাকে বলেছে ঘটনার সময় এখানে তাদের থাকারই দরকার নেই।'

'নেই-ই তো। লঞ্চের ট্র্যান্সমিটার থেকে রেডিও বিম পাঠানো হবে...ষাট কি সত্তর মাইল দূর থেকে ইলেকট্রনিকালি ডেটোনেট করা হবে।' লোকটা মারা যাচ্ছে, তারপরও চেহারা থেকে বিদ্রূপ ও চ্যালেঞ্জের ভাবটুকু মুছল না। 'যাও, রানা, ওদেরকে বাধা দাও! প্রার্থনা করি তোমাকে খুন করে ক্যাপটেন সুরাইয়া যেন নিজের ভুলটা শুধরে নিতে পারেন!'

'এখন তোমার নিজের জন্যে প্রার্থনা করা উচিত না?'

যেন রানার কথার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে চোখ বুজল মোরেল, নরম নিঃশ্বাসের সঙ্গে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেল তার প্রাণবায়ু।

ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেনদেরেস ও লেমনস্কি। 'কি বলল শুনলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মেনদেরেস। 'একটা ব্যাপার বুঝলাম না। বলল, ওরা রিফের নীচে নেমেছে। এর মানে কী?'

লঞ্চ থেকে ফরচুনার ডেকে চলে এল ওরা, কাপড়চোপড় খুলে ফেলছে।

'বোট নিয়ে অপরদিকে যেতে কতক্ষণ লাগতে পারে?' জানতে চাইলেন মেনদেরেস।

'আধ ঘণ্টার কম নয়,' বলল রানা। 'তাছাড়া, খুবই বিপজ্জনক এলাকাটা। রিফের ভেতর দিয়ে গেলে ওদেরকে আমরা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলব। কাফ্রি সরদার ফরচুনাকে নিয়ে ঘুরপথে পৌঁছাবেন, বয়ার কাছ থেকে তুলে নেবেন আমাদেরকে।'

অ্যাকুয়ালাঙগুলো ডেকে নিয়ে এল সরদার। দ্রুত ওগুলো পরে নিল ওরা। রানা ডাকেনি, নিজে থেকেই এগিয়ে এসে ওর

স্ট্র্যাপগুলো আঁটসাঁট করে আটকে দিল আইরিন। তার চোখ-মুখ শান্ত, চোখের দৃষ্টি স্থির। কাজটা সেরে হুইলহাউসে ঢুকে বাপের পাশে বসল সে।

রানা ও মেনদেরেসের কাছে একটা করে স্পিয়ার গান থাকল। ছয় ফুটি বোট হুকের শেষ মাথায় স্পেয়ার হার্পুন বেঁধে নিয়ে একটা স্পিয়ার বানালেন কর্নেল লেমনস্কি।

সবাই তৈরি হওয়ার পর সরদারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কুয়াশা থাকলেও, বয়ার কাছে পৌঁছাতে আধঘণ্টার বেশি লাগবে না আপনার। ওখানে দেখা হবে।'

মাথা কাত করল কাফ্রি সরদার।

রানার পিছু নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে নেমে পড়লেন বাকি দুজন।

## ঊনিশ

ভোরবেলা সাগরের নীচে ধূসর-সবুজাভ ছায়া খেলা করছে। ওঁদের দুজনের জন্য কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর সামনের দিকে সাঁতার শুরু করে ফসফরেসেন্ট মেঘের ভিতর ঢুকে পড়ল।

স্রোত ওদেরকে টেনে নিচ্ছে রিফের দিকে। দ্রুতবেগে ফিন ছুঁড়ে ডাইভ দিল রানা, সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে খিলান আকৃতির প্রবেশপথের দিকে।

পথ যেন শেষ হতে চাইছে না। রোদের আভা বহু জায়গায় বদলে দিয়েছে প্রবালের স্বাভাবিক রঙকে, ফলে দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি হচ্ছে, যেন কোনও জলমগ্ন ক্যাথেড্রালের ভিতর দিয়ে সাঁতরাচ্ছে

ওরা।

এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তবে এরইমধ্যে রঙ বদলাতে শুরু করেছে সাগরের পানি। আরও কয়েক মিনিট পর রানা অনুভব করল, বিপরীতমুখী দুটো স্রোতে একটা জায়গায় মিলিত হয়ে আলোড়ন তুলছে পানিতে, অর্থাৎ চ্যানেলে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

পানির উপর মাথা তুলতেই বয়াটাকে দেখতে পেল রানা। সাগরের পানিতে বড়সড় লাল একটা বুদ্বুদ, প্রায় তিনশো গজ দূরে। কম্পাসের সাহায্যে দ্রুত একটা ফিক্স নিয়ে ডুব দিল ও। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মেনদেরেস ও লেমনস্কি। তাঁদেরকে পিছু নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে এগোল ও।

আশ্চর্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে সাগর। এরইমধ্যে ধূসর ভাব দূর হয়েছে, স্বচ্ছ সবুজ পানির ভিতর দৃষ্টিসীমা এত ভাল যে অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওদের নীচে, বামদিকে, ঢালু হয়ে নেমে গেছে রিফ। আশ্চর্য নীরব, ভৌতিক একটা জগৎ; তার ভিতর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। ওকে এড়াবার জন্য দু-ভাগ হয়ে ছুটছে মাছের ঝাঁকগুলো।

ওদেরকে রানা দেখতে পেল যেন উল্টো করা একটা টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে, অথচ তারপরও দৃশ্যটা বেশ পরিষ্কার। রিফের ঢালু গা বেয়ে নেমে গেছে বয়ার চেইন, সারফেসের ঠিক নীচে পাঁচটা মূর্তি ওটার চারপাশে জড়ো হয়েছে।

আগের মত একই গতিতে এগোচ্ছে রানা, হাতে বাগিয়ে ধরা স্পিয়ার গান, ওর দু'পাশে মেনদেরেস ও লেমনস্কি। এক মুহূর্ত পর ওদেরকে দেখতে পেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তিনজন, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

এখন শুরু হবে বাঁচা-মরার যুদ্ধ।

রানার চোখ একা শুধু মাঝখানের লোকটার উপর স্থির। নিজের লাগাম টেনে রেখেছে, সময়ের আগে যাতে ফায়ার করে

না বসে। লোকটা থামল, পানিতে হাত-পা নাড়ছে, সম্ভবত ওদের এগোনোর বিরতিহীন গতি লক্ষ করে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। স্পিয়ার গান ডিসচার্জ করল সে, রুপালি বুদ্বুদের মেঘ তৈরি হলো। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল রানা, তারপর নীচ থেকে ফায়ার করল।

লোকটার পেটে ঢুকল হার্পুন, পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথায় এমন প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল যে রানার হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্রটা। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখতে পেল ওর বাম পাশে এক লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন মেনদেরেস, ডান পাশে হাতে বানানো বেঢপ স্পিয়ার দিয়ে নিজের প্রতিপক্ষকে আঘাত হানার চেষ্টা করছেন লেমনস্কি। এক পলক ইতস্তত করে বয়ার দিকে এগোল ও।

বড়সড় একটা প্যাকেজ বয়ার ঠিক নীচে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাচ্ছে সুরাইয়া ক্যারাভান, তাকে সাহায্য করছে আত্রাই।

রেশমি চুলের স্তূপ গাঢ় মেঘের মত ভেসে আছে সুরাইয়ার চারপাশে, এবং কাঁধের উপর দিয়ে রানার দিকে তাকাবার সময় জ্যান্ত প্রাণীর মত ঢেউ তুলল ওগুলো।

বেল্টে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা বের করে নিয়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে আত্রাই। নিজের ছুরি আগেই বের করে বাম হাতে রেখেছে রানা। মুহূর্তের জন্য মনে হলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে ওরা। তবে না, দ্রুত সরে গিয়ে ইহুদি অপারেটরের কোপটা এড়াল রানা, বেঁচে গেল আধ ইঞ্চির জন্য।

ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আত্রাই, তার চোখ ফাঁকি দিয়ে সারফেসে উঠে এল রানা। এক মুহূর্ত পর ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিল আবার।

ছয় ফুট নীচে ভেসে রয়েছে আত্রাই, রানার খোঁজে মাথাটা উন্মত্তের মত এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে। উপর থেকে নেমে এল রানা, ডান হাত দিয়ে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরল, তারপর বুকের একজোড়া হাড়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল ছুরিটা।

ছুরির ডগা হার্ট ভেদ করে গেছে, পানিতে নিষ্ফল হাত-পা ছুঁড়ছে আত্রাই। গলা ছেড়ে দিতে রিফের দিকে নামতে শুরু করল শরীরটা, অলস ভঙ্গিতে পাক খাচ্ছে।

ঘুরতে যাচ্ছে রানা, পানিতে আকস্মিক একটা আলোড়ন সতর্ক করে তুলল ওকে। তবে কিছু করবার সময় পাওয়া গেল না, তীর আগেই ছোঁড়া হয়ে গেছে। ওর ঘোরাটা দ্রুত হয়ে উঠল ডান কাঁধে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগায়।

জিনিসটা কী দেখতে পেয়ে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ডান হাত দিয়ে মুঠোর ভিতর ধরল হার্পুনটা, টান দিয়ে মাংস থেকে বের করবার সময় তীব্র ব্যথায় হাঁপিয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে দম ছেড়ে তাকাল রানা। কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরাইয়া, এক হাতে স্পিয়ার গান, হার্পুনটা লাইনের শেষ মাথায় ঝুলছে। এতক্ষণে ওকে চিনতে পেরেছে সে, বুঝতে পারল রানা। ফ্লিপার ছুঁড়ে তার দিকে এগোল ও।

স্পিয়ার গান ছেড়ে দিল সুরাইয়া। কোমরের কাছ থেকে একটা ছুরি বের করে ঘুরল সে, দ্রুত সাঁতার কেটে রানার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

শুরু হলো ধাওয়া। রানার হাতেও একটা ছুরি।

রিফের কিনারা পার হওয়ার সময় রানার কাছ থেকে দশ কি বারো ফুট সামনে থাকল সুরাইয়া। রানা আহত হয়েছে, ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, এ-সব দেখে যতটা পারা যায় সাগরের আরও গভীরে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে সে। এভাবে নামতে থাকলে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করবে ও।

সুরাইয়ার কৌশল সম্পর্কে সচেতন রানা। তার পিছু নিয়ে নামছে ঠিকই, তবে সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিয়ে খানিক পরই তাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল, তারপর ঘুরে গিয়ে তার পথ আগলাল।

একটা কৌশল ব্যর্থ হয়েছে, হোক, হাতের ছুরি বাগিয়ে ধরে আক্রমণের জন্য তৈরি হলো সুরাইয়া। তার আচরণ দেখে যে-কারও মনে হবে নিজের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের কোনও অভাব নেই।

তারপর এক দুই করে কয়েকটা সেকেন্ড পার হলো। কিছুই ঘটল না।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না সুরাইয়া। ইতোমধ্যে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে রানা, সাগরের এই প্রায় একশো ফুট গভীরতায় ওকে দেরি করিয়ে দিতে চাইছে সুরাইয়া, উদ্দেশ্য রক্তক্ষরণে দুর্বল হতে সাহায্য করা ওকে, তা হলে ডিকমপ্রেশনের নিয়ম মেনে সারফেসে ওঠার শক্তি পাবে না ও; কিংবা রক্তের গন্ধ পেয়ে একটা হাঙর এসে তার সমস্যার সমাধান করে দেবে।

নিজেই এগোল রানা। এই সময় চট করে একবার উঁকি দিয়ে নিজ অন্তরের অন্তস্তলটা দেখে নিল ও। সেখানে প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও মনোবাঞ্ছাই এ-মুহূর্তে অবশিষ্ট নেই।

এটাকে স্রেফ জরুরি একটা কাজ বলে মনে করছে ও। সুরাইয়ার বেঁচে থাকাটা অনেক নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের জন্য ক্ষতিকর, কাজেই তাকে চলে যেতে হবে।

রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রাণে বাঁচার নতুন একটা কৌশল ধরল সুরাইয়া। হাতে ছুরি থাকলে কী হবে, জানে রানার সঙ্গে পারবে না সে। ওকে দেখিয়ে স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র হলো সে, হাত থেকে ফেলে দিল একমাত্র অস্ত্র ছুরিটা। তার বিশ্বাস নিরস্ত্র একটা মেয়েকে আঘাত করতে পারবে না রানা, ওর বিবেক ও নীতি বোধ বাধা দেবে। হাজার হোক, এক সময় তো তার প্রেমে পাগল ছিল ও!

তারপরও রানা এগিয়ে আসছে দেখে স্থির হয়ে ভেসে থাকল ক্যাপটেন সুরাইয়া। আসছে ঠিকই রানা, তবে মনে হলো তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। যাচ্ছিলও, গেলও, তবে যাওয়ার সময়

ছুরির একটা পোঁচ দিতে ভুলল না।

তাতে অবশ্য কোনও রক্তক্ষরণ হলো না। সুরাইয়ার পিঠের সিলিন্ডার ও মাউথপিসের মাঝখানের টিউবটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে কমপ্রেসড এয়ার, ওদিকে অক্সিজেনের অভাবে ছটফট শুরু করেছে সুরাইয়া।

একবারও সেদিকে না তাকিয়ে সাগরের গহীন গহ্বর থেকে উঠতে শুরু করল মাসুদ রানা।

***